Rajshahi University journal of arts & law Vol. 49 (2021) pp. 37-72
ISSN 2309-0898

মুসলিম চিত্রকলায় নারী চরিত্র : একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ টি এম রফিকুল ইসলাম*

Abstract

Painting — which is thought to be one of the unique chapters in the history of art and civilization and which emerged, developed and culminated in the various Muslim countries of Afro-Asia and Europe — is universally known as Islamic or Muslim painting. In the very beginning, Muslim painting appears to have been limited to mosaic and fresco paintings in beautifying or decorating some of the magnificent buildings — both religious and secular in character, of the Umayyads and the early Abbasids. The importation of paper from China at the end of the 8th century and later on manufactured locally at Samarkand and Baghdad by the Abbasids led to the ushering of a new era in Islamic painting. From then onwards the manuscript illustrations — the subject-matter being mainly history, philosophy, medicine, machinery, astronomy, epic, love-stories and religious — continued to have been dominantly executed throughout the Muslim world till the 18th century. Paintings thus depicted, having both educative and aesthetic values, exhibit the images of numerous non-living abstract designs and living figural subjects. The present paper aims at making a brief critical and analytical study of only some selected female representations accomplished by different schools of Muslim painting.

ভূমিকা

চিত্রকলা বৈশ্বিক শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং সমকালীন ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক উৎস। মানব জাতির সৃজনশীল সুকুমার শিল্পের ইতিহাসে সর্বজনীনভাবে ইসলামী চিত্রকলা, আর বিভাজিত অর্থে মুসলিম চিত্রকলা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।[১] বিশ্বের এ শিল্প সংযোজনে মুসলিম ও অমুসলিম চিত্রশিল্পীদের উদ্ভাবনী শক্তি, রঙ ও তুলীর মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টিকে চিরভাস্বর করে রেখেছে। প্রসঙ্গত মুসলিম চিত্রকলার প্রতি অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল বলে মনে হয় না। কারণ সে সময় ইসলামী বা মুসলিম চিত্রকলার কোনো অস্তিত্ব ছিল না বলেই ইতিহাস পর্যেষণে জানা যায়। মূলত মুসলিম চিত্রকলার সূত্রপাত খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে উমাইয়া শাসনামলে নির্মিত ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত অলংকরণে ব্যবহৃত মোজাইক ও ফ্রেসকো চিত্রকলার মধ্যদিয়ে। পরবর্তীতে আব্বাসীয় শাসনামলে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনৈক চৈনিক কারিগরের সহায়তায় প্রথমে সমরখন্দে এবং পরে ৭৯৪ সনে বাগদাদে স্বতন্ত্র কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অন্যান্য শাখার পাশাপাশি মুসলিম চিত্রকলা নতুন একটি মাধ্যমের সহায়তায় ফ্রেসকো থেকে পাণ্ডুলিপিতে রূপান্তরিত হয়।[২] আর পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, একদিকে যেমন বিমূর্ত বিষয়বস্তু অবতারণার মাধ্যমে পাণ্ডুলিপির সৌন্দর্য সৃজনপূর্বক সুধী সমাজের নিকট চিত্তাকর্ষক করা, অন্যদিকে তেমনি প্রাণিবাচক বিষয়বস্তু উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে ঘটনাকে চিত্রিত করে পাঠকের মধ্যে উপলব্ধি সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ইসলামী চিত্রকলার মূল লক্ষ্য লালিত্য সাধন এবং ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে বোধগম্য হওয়া। উল্লেখ্য যে, ইসলামী

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ; ই-মেইল: rafiq.ihc.ru@gmail.com

চিত্রকলায় প্রাণিবাচক ছবি অঙ্কন নিয়ে যে তর্কবিতর্ক – খ্রিষ্টীয় নবম শতকে হাদীস সংকলনের সময় থেকে তার সূত্রপাত। তৎসত্ত্বেও সুন্দরের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির অকৃত্রিম আবেদনের ফলে কালপরিক্রমায় মুসলিম চিত্রশিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে এবং ধর্মীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণে চিত্রকলার ন্যায় সুকুমার বৃত্তি চর্চায় তারা আত্মনিয়োগ করে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার চিত্রশিল্পের মতোই এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইসলামী চিত্রকলার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

ইসলামী চিত্রকলা একদিকে যেমন প্রাক-ইসলামী গ্রেকো-রোমান, সাসানো-বাইজান্টাইন ও প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আত্মীকরণ করেছে, ঠিক তেমনিভাবে চিত্রে আরবী পরবর্তীতে ফার্সি ও তুর্কী লিপি (আরবী লিপির সংস্করণ) এবং বিমূর্ত আরব্য নকশা ব্যবহার করে চিত্রকে সৌন্দর্যকরণের পাশাপাশি ইসলামীরূপে মহিমান্বিত করা হয়েছে। আর চিত্রে লিপিকলা ও আরব্য নকশার ব্যবহার ইসলামী চিত্রকলার এক নতুন সনাক্তকারী বিদ্যা বা আইকনগ্রাফীর জন্ম দিয়েছে।[৩] এ ক্ষেত্রে বিজিত অঞ্চলের উন্নত সভ্যতা তথা চিত্রকলা ও অমুসলিম চিত্রশিল্পীদের অবদানের কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কেননা 'সংস্কৃতির ধারা নদীর স্রোতের মতো সর্বদা প্রবাহমান' — এ সত্যটি সর্বজন-স্বীকৃত এবং অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় ইসলামী চিত্রকলার ক্ষেত্রেও সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। বলাবাহুল্য মুসলিম চিত্রকলায় প্রাণিবাচক ও বিমূর্ত নকশা উভয় ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো ইসলামী চিত্রকলায় কেন প্রাণিবাচক বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে? এর প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, ইসলামী চিত্রকলায় প্রাণির চিত্রাবলী কোনোভাবেই পূজার সামগ্রি হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি — ইসলাম পূর্ব যুগেও নয় এমনকি ইসলামী আমলেও নয় — এসেছে সৌন্দর্য বর্ধনের উপাদান ও প্রায়োগিক উপকরণ হিসেবে — হতে পারে সেটি শিক্ষণ উপকরণ কিংবা উপদেশমূলক তত্ত্ব প্রদানের লক্ষ্যে। সর্বোপরি একজন সুশিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ একটি সামান্য মূর্তি বা চিত্রকে সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে পূজা-অর্চনা করবেন এমনটি মনে করার কোনো সুযোগ নেই। প্রসঙ্গত মুসলিম চিত্রকলায় অন্যান্য মূর্ত বিষয়বস্তুর পাশাপাশি মনুষ্য চরিত্র বিশেষ করে নারী চরিত্র প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে — সে প্রাসঙ্গিকতা হতে পারে সমাজের বাস্তবধর্মী ঘটনার উপস্থাপন কিংবা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন। অর্থাৎ ইসলামী চিত্রকলায় সাধারণত সম-গুরুত্ব দিয়ে চিত্রে নর-নারী চরিত্র উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। তবে কখনো কখনো কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে, আবার কোনো কোনো সময় সহ-চরিত্ররূপে চিত্রকলায় নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো মুসলিম চিত্রকলায় উপস্থাপিত নারী চরিত্রের কর্মকাণ্ড ও তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা। উল্লেখ্য যে, মুসলিম চিত্রকলার পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু সাধারণত ধর্মবিষয়ক, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানধর্মী, প্রচলিত কাহিনী, ইতিহাস সম্পর্কিত, প্রেমমূলক ও আধ্যাত্মিক কাব্যধর্মী। এসব পাণ্ডুলিপির ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চিত্রিত অসংখ্য ছবির মধ্য থেকে নিবন্ধের কলেবরের কথা বিবেচনায় নিয়ে কিছু নির্বাচিত চিত্র পর্যালোচনাপূর্বক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

আরব চিত্রকলায় নারী চরিত্র

দক্ষিণ-পূর্ব সিরিয়া ও আরব উপদ্বীপের উত্তরে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়কে নির্দেশ করতে 'আরব' শব্দটি খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকের (৮৫৩) মধ্যাহ্ন পর্বে প্রথম দৃশ্যমান হয়।[৪] আর তখন থেকে শব্দটি ক্রমবর্ধমানরূপে ব্যাপক ব্যবহৃত হলেও কালের বিবর্তনে সংগার্থে এটি অধিকতর দুর্বোধ্য পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। যাহোক মহানবী (সা.)-এর জন্মভূমি হিজাজে ইসলাম বিস্তারের সাথে সাথে আরব শব্দের নানাবিধ প্রচলন ঘটে। কুরআনে ব্যবহৃত প্রারম্ভিক আরব অর্থে হিজাজের বেদুঈন এবং মক্কা, মদীনা ও তায়েফের অধিবাসীদের বুঝানো হতো।[৫] কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে এর বিস্তৃতি

হিজাজ অতিক্রমপূর্বক প্রথমে সম্পূর্ণ আরব ভূখণ্ডে এবং পরে ইউরো-আফ্রো-এশিয়ার বিজিত অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। উল্লেখ্য যে, কুরআনের ভাষা আরবী হওয়ায় প্রথমে ধর্মীয় ভাষা এবং পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে আরবীর প্রচলন ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে এ ভাষা বিজয়ের পথ ধরে সিরীয়, পাহলভী, কপ্টিক, স্থানীয় বারবার এমনকি তুর্কী ভাষাকে পাশকাটিয়ে একটি স্থায়ী রাষ্ট্র ভাষারূপে মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং কুরআনের ভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে যারা আরবীকে আত্মীকরণ করেছে তারাই সামগ্রিক ও সার্বজনীনভাবে আরব হিসেবে পরিগণিত। একদা এ ভাষা হিজাজ পেরিয়ে পশ্চিমে স্পেনের পিরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত এবং পূর্বে সিন্ধুর তীরবর্তী অঞ্চল ও মধ্যএশিয়ার তাসখন্দসহ উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল বলেই এতদঞ্চলের অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে আরব নামে পরিচিত।[৬] আর ভাষা ভিত্তিক আরবীয়দের যে ইতিহাস তাই আরব ইতিহাস এবং শিল্পকলার ইতিহাসে আরব চিত্রকলা নামে অভিহিত। সুতরাং উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, মাগরেবীয় ও মামলুক শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় চর্চিত চিত্রকলাকে সর্বজনীনভাবে আরব চিত্রকলা এবং বিভাজিত অর্থে বংশীয় নামানুসারে কিংবা স্থানিক নামানুযায়ী মেসোপটেমীয় চিত্রকলা, ফাতেমীয় চিত্রকলা, মাগরেবীয় চিত্রকলা এমনকি মামলুক চিত্রকলা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

উমাইয়া ও প্রারম্ভিক আব্বাসীয় শাসনামলে পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণের কোনো উদাহরণ পাওয়া না গেলেও এসব যুগে মোজাইক ও ফ্রেসকো চিত্রকলার নজির বিদ্যমান নিদর্শন থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। আর পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণ আব্বাসীয় আমলের শেষার্ধে সূচিত হয়েছিল, যার মধ্যে আল-কাযভিনীর *আযাইব আল-মাখলূকাত*, বিদপাই-এর *কালীলা ওয়া দিমনা*, হারীরীর *মাকামাত*, আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানীর *কিতাব আল-আগানী*, ডায়োসকোরিডিসের *ম্যাটেরিয়া মেডিকা*, সিওডো-গ্যালিন রচিত *কিতাব আদ-দিরইয়াক*, *রাসাইল ইখওয়ান আস-সাফা*, *হাদীছ বায়াদ-উ-রিয়াদ*, মুহতার ইবনে হাসান ইবনে বুলতানের *রিসালাত দাওয়াত আল-আতিব্বা*, আল-জাহিযের *কিতাব আল-হায়ওয়ান*, ইবনে গানীম আল-মাকদিসীর *কাশফ আল-আসরার* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের ইসলামী চিত্রকলার খ্যাতিমান চিত্রকর হলেন ইয়াহিয়া বিন মাহমুদ আল-ওয়াসিতী, যিনি সামগ্রিক ইসলামী চিত্রকলার ভিত রচনায় অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর রঙ-তুলীর স্পর্শে প্রারম্ভিক ইসলামী চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষণহীনতার অবসানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং চিত্রের গতিশীলতা ও স্বাভাবিকতা বহুলাংশেই ফিরে আসে, যার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছিল পারসিক ও সমসাময়িক ভারতীয় মোগল চিত্রকলায়। উল্লেখ্য যে, প্রারম্ভিক মুসলিম শিল্পকলার চিত্ররীতি ছিল বাস্তবমুখী ও প্রকাশধর্মী।

মোজাইক ও ফ্রেসকো চিত্ররীতির মধ্যদিয়ে মূলত ইসলামী চিত্রকলার সূত্রপাত। মোজাইক চিত্রকলায় [কুব্বাত আস-সাখরা (৬৯১) ও দামেস্ক জামি মসজিদ (৭০৫-১৫)] সাধারণত বিমূর্ত অলংকরণ বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হলেও ফ্রেসকো চিত্রকলায় বিমূর্ত নকশার পাশাপাশি মানবমূর্তিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণির চিত্রাবলীর উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকবর্গ অবিভক্ত সিরীয় অঞ্চলে (বর্তমান জর্ডান, প্যালেস্টাইন, লেবানন ও সিরিয়া) বেশকিছু প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, যেগুলো খলিফাদের বাগানবাড়ি হিসেবে অবকাশ যাপনে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা হয়। প্রাসাদসমূহ রোমান *কাস্ট্রার* ন্যায় নির্মিত হওয়ায় এ স্থাপত্যে হাম্মাম বা স্নানাগারের বিশেষ স্থান ছিল এবং এসব স্নানাগারে যে হেলেনিস্টিক ও সাসানীয় চিত্ররীতির অনুকরণে বিভিন্ন কর্মরত মানুষ ও পশুপাখির ছবি অঙ্কিত ছিল তা কুসাইর আমরা, পরবর্তীতে কাসর আল-হাইর আল-গারবী, খিরবাত আল-মাফজার ও জাওসাক আল-খাকানী প্রাসাদে অঙ্কিত চিত্রাবলী থেকে অনুমান

করা যায়। কেননা প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্যের অনুকরণে নির্মিত এসব মরু প্রাসাদ হয়তোবা খলিফাদের চিত্তরঞ্জন ও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। যাহোক ইসলামী স্থাপত্যে কুসাইর আমরা প্রাসাদে (অষ্টম শতক) সর্বপ্রথম ফ্রেসকো চিত্রকলা পরিলক্ষিত হয়। প্রাসাদটি জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে ৭৫ কিলোমিটার পূর্বে মরু অঞ্চলে অবস্থিত। চুনা পাথরে নির্মিত আলোচ্য প্রাসাদটি মোটামুটিভাবে সুরক্ষিত এবং সংঘবদ্ধ দুটি অংশে বিভক্ত। পশ্চিমের আয়তাকার অংশটি হলঘর ও খলিফার ব্যবহারের লক্ষ্যে খাসকক্ষ হিসেবে নির্মিত হলেও পূর্বদিকের যৌগিক অংশটি অবগাহনের উদ্দেশ্যে তৈরি। অর্থাৎ শেষোক্ত অংশের জন্য কুসাইর আমরা প্রাসাদটি সাধারণভাবে একটি স্নানাগার হিসেবে সুবিদিত।

কুসাইর আমরার চিত্রাঙ্কিত বিষয়বস্তুর মধ্যে স্নানের দৃশ্যাবলী, শরীরচর্চা, বিভিন্ন প্রকারের মৃগয়া, উপজীবিকা, নর্তকী, সঙ্গীতজ্ঞ, বংশীবাদক, রাজন্যবর্গ, প্রতীকস্বরূপ নানা চিত্রাবলী, রাশিচক্রের চিত্রসমূহ প্রভৃতি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে।[৭] এদের মধ্যে হাম্মামখানার ফ্রেসকো চিত্রে নারীমূর্তি উপস্থাপিত হয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত। রঙের মধ্যে উজ্জ্বল নীল, গাঢ় পিঙ্গল, হালকা পিঙ্গল, বিবর্ণ পীত ও নীলাভা সবুজ প্রধান। হাম্মামখানা আবার তিনটি কক্ষের যথাক্রমে বেশ পরিবর্তন কক্ষ (apodyterium), ঈষদুষ্ণ স্নানকক্ষ (typidarium) এবং উষ্ণ স্নানকক্ষের (calidarium) সমন্বয়ে গঠিত। ঈষদুষ্ণ স্নান কক্ষের ছাদের চিত্রসমূহ মোটামুটিভাবে সুরক্ষিত ও স্পষ্ট। তিনটি নারীমূর্তির প্রতিকৃতি সংবলিত এ চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে (চিত্র-১)। এদের একজন অর্ধশায়িত, অপরজন একটি শিশুকে ধরে রেখেছে এবং তৃতীয়জন দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছে। তাদেরকে পরিচ্ছদহীন বিবসনা অবস্থায় চিত্রণ করা হয়েছে এবং দৃশ্যটি হয়তোবা স্নানের পূর্ব প্রস্তুতির কথাই ঘোষণা করছে। প্রসঙ্গত নারীদের তন্বীদেহ আকর্ষণীয় উদ্ভাসনে চিত্রকর যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয় চিত্রের দৈহিক কাঠামো ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার শরীরের ভারিক্কি চেহারা, চুলের বিন্যাস এবং মুখাবয়ব দৃষ্টে তাকে অনারব-আফ্রিকীয় বা দক্ষিণ ভারতীয় পরিচারিকা হিসেবে সনাক্ত করা যায়।[৮] এটিংহাউসন তাঁর *আবর পেন্টিইং* গ্রন্থে নারী চরিত্রের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, In their plastic forms, play of light and shadow and natural movements these figures show their dependence on the Roman tradition, but in their physical aspect these massive feminine forms reflect a concept of beauty that is far removed from the classical age।[৯] আবার বেশ পরিবর্তন কক্ষের হীরক আকৃতির ও বারোটি ত্রিভুজের মধ্যাংশে নৃত্যরতা নারীমূর্তিসহ কিছু প্রাণির চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। উক্ত কক্ষের নারীমূর্তির পোষাকের সাথে পামিরাস্থ একটি সমাধির বিজয় প্রতিকৃতির পরিচ্ছদের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই নারীমূর্তি দুটি লম্বিত ঘাঘরা জাতীয় পোষাক ও আজানুলম্বিত কামিজ পরিহিত। কটির অংশ সরু এবং গলাবন্ধনী বিশিষ্ট হলেও শেষোক্ত পরিচ্ছদ গ্রীক ছিটনের প্রতিকৃতি হতে পারে।[১০] উল্লেখ্য যে, নারী চরিত্রের ভারী নিতম্বর, সরু কটিদেশ ও প্রসারিত বক্ষের চিত্রায়ণ সমসাময়িক আরব আদর্শ মহিলাদের দৈহিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আরব কবিতায় বর্ণিত নারীদের সৌন্দর্যের প্রতিফলন। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কুসাইর আমরার চিত্রাবলী সমকালীন চিত্রশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন এবং প্রাক-মুসলিম চিত্ররীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও উমাইয়া শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের একক ও অনন্য পরিস্ফুটন।

ফ্রেসকোর অন্য দুটি উদাহরণ উমাইয়া প্রাসাদ কাসর আল-হাইর আল-গারবীতে পরিলক্ষিত হয়। পামিরা থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে সিরিয়ার মরু অঞ্চলে অবস্থিত এ প্রাসাদটি খলিফা হিশাম কর্তৃক ৭২৭ সনে নির্মিত হয়েছিল বলে নিকটস্থ সরাইখানার একটি লিপি থেকে জানা যায়।[১১] ১৯৩৬ সনে শ্লুমবার্গার কর্তৃক খননাবিষ্কারের ফলে প্রাসাদটির তথ্যাবলী সুধি সমাজে পরিবেশিত হয়। আলোচ্য প্রাসাদের দুটি অংশ উন্মোচিত হয়েছে — একটি মূল প্রাসাদ এবং অপরটি সরাইখানা। প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সিঁড়িকক্ষের মেঝেতে ফ্রেসকো রীতিতে অঙ্কিত অলংকরণ বিষয়বস্তু যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক।

বলাবাহুল্য একটি রূপকাশ্রিত নারী মূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব কোণস্থিত কক্ষের চিত্রটি অঙ্কিত (চিত্র-২)। ছবিটি আয়তাকার পরিকল্পনায় রচিত ও বলিষ্ঠ পাড় নকশায় আবদ্ধ। হেলেনিস্টিক ভাবধারায় চিত্রিত পাড়টি আবর্তিত আঙ্গুর লতায় সজ্জিত। প্রতিটি আবর্তিত অংশের মধ্যাংশে দু-গুচ্ছ কৃষ্ণাভা রঙের আঙ্গুর লতা শোভা বর্ধন করে আছে। উল্লেখ্য যে, পেঁচানো দ্রাক্ষালতার নকশা ইসলামী শিল্পকলার এক জনপ্রিয় বিষয়বস্তু, যা বহুকাল যাবৎ নিকটপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রচলিত ছিল।[১২] যাহোক লতা ও আঙ্গুর কৃষ্ণাভ এবং ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত। চিত্রের ১.৮০ মিটার ব্যাসার্ধের কেন্দ্রস্থলে গোলায়িত মেড্যালাকৃতির একটি নকশা বিদ্যমান। বৃক্ষ-পল্লবীসমেত ঈষৎ লাল রঙের পটভূমির মধ্যবর্তী অংশে অঙ্কিত একজন মহিলার প্রতিকৃতি চিত্র যথেষ্ট নয়নাভিরাম এবং সন্মুখ দর্শানোর ভঙ্গিতে চিত্রিত। রোমান পুরাণশাস্ত্র মতে তিনি একজন ভূমি দেবী বা মাতৃদেবী পৃথিবীতে যার আবির্ভাব ঘটেছে এবং বৃত্ত পরিবেষ্টিত ধরিত্রীদেবী ঋতুর প্রতিরূপ 'গী'।[১৩] বৈচিত্র্যময় পোষাক পরিহিত নারী মূর্তির কণ্ঠে চিত্রিত মুক্তারমালা সাসানীয় বৈশিষ্ট্যে গর্বিত।[১৪] মূর্তিটির গলায় পেচানো একটি কুণ্ডলিত সর্প অঙ্কিত। সর্পের মণ্ড মূর্তির দক্ষিণ স্কন্ধ ও লেজ বাম স্কন্ধের দিকে প্রসারিত। দেবীর গলায় পেচানো পুষ্যিত সর্পটি প্রচীন সুমার ও ব্যববিলনীয় সাপের ন্যায় নিরাময় শক্তির প্রতীক।[১৫] তার মূখাবয়বে প্রফুল্লের ছাপ প্রস্ফুটিত এবং দু-হাত দিয়ে ফলমূল ভর্তি রুমাল সদৃশ থলে বক্ষবধি উত্তোলন করে রেখেছে। মূর্তির রঙ ঈষৎ লাল, কিন্তু মাথার কেশ কৃষ্ণ বর্ণের। মেড্যালটির উপরে চিত্রটি কালো রঙের লতাপাতাসহ দু-জন পশু-প্রকৃতি পেশীবহুল দানব মূর্তিতে পূর্ণ। শ্লুমবার্গার এসব কল্পিত প্রাণিকে 'সামুদ্রিক নরাশ্ব' (marine centaurs) বলে অভিহিত করলেও ক্রেসওয়েল 'সৈন্ধব দানব' (marine monster) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৬] মূর্তিসমূহের নিম্নাঙ্গ কুণ্ডলীকৃত মেঘের ন্যায় কালো রঙে রঞ্জিত। তাদের বাম হাতে বল্লম এবং ডান হাত প্রসারিত ভঙ্গিমায় অঙ্কিত। দেখে মনে হয় যেন তারা ভূমি দেবীকে আকাশ পানে উড্ডয়নের চেষ্টা করছে। মেড্যালটির নিম্নের চিত্রটি অস্পষ্ট। তবে দুটি সারস পাখি, দুটি শৃগাল এবং একটি কুকুরসহ একদল প্রাণির প্রতিকৃতি সহজেই সনাক্ত করা যায়। ধূসর পশ্চাতভূমির উপর চিত্রিত সমগ্র চিত্রটি রহস্যেভরা ও রূপকময়।

কাসর আল হাইর আল-গারবী প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব সিঁড়ি কক্ষের চিত্রটি আয়তাকার ও বিমূর্ত পুষ্পপাড় বিশিষ্ট। চিত্রটি তিনটি অসম সমান্তরাল অংশে বিভক্ত। উপরের অংশে ঈষৎ অশ্বনলাকৃতির খিলানের নিম্নে দু-জন সঙ্গীতশিল্পীর চিত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় চিত্রিত (চিত্র-৩)। উল্লেখ্য যে, খিলানের স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ অঙ্কনে অপরিপক্কতার ছাপ উপলব্ধি করা যায়। দক্ষিণ দিকেরটি বাঁশি বাদনরত একজন পুরুষের মূর্তি এবং বামদিকে বীণাবাদনরতা অপর এক নারী মূর্তির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উভয় মূর্তি হালকা বেগুনী, ঈষৎ সবুজ ও লাল রঙের ঢিলাঢালা আজানুলম্বিত দীর্ঘ গাউন পরিহিত, যার ভিতরে একজনের লাল রঙের এবং অপর জনের সবুজ রঙের পাজামা সদৃশ পরিধেয় বস্ত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদের মাথার কেশ কৃষ্ণ বর্ণের এবং তারা উভয়ে একেঅপরের দিকে তাকিয়ে গান পরিবেশন করছে। দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশনের এহেন দৃশ্য আধুনিক সমাজেও লক্ষ্য করা যায় এবং বিনোদনের এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তাদের পরিহিত হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত ঢিলাঢালা পোষাক বাইজান্টাইন শিল্পরীতির অনুকরণে চিত্রিত বলে ধারণা করা যায়। আর খিলানসারিতে উদ্ভিদ ও ফুলেল নকশার বিন্যাস এবং সঙ্গীত শিল্পীদের সন্মুখে উপস্থাপিত পাত্র নকশা সাসানীয় ঐতিহ্যের কথাই ঘোষণা করছে।[১৭] মধ্যাংশের চিত্রটি একজন তরুণ শিকারীর চিত্র যে দুরন্ত অশ্বের পৃষ্ঠ থেকে দুটি হরিণকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছে, যাকে ক্রেসওয়েল যুগল বক্রতা বিশিষ্ট তুর্কী ধুনকের প্রতিরূপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৮] শিকারীর মস্তক ও কটিদেশ ফিতায় বাঁধা হলেও পিছনে উড়ন্ত অবস্থায় অঙ্কিত এবং তার পা রেকাবে রক্ষিত।[১৯] মুসলিম চিত্রশিল্পের ইতিহাসে রেকাবের উদাহরণ সম্ভবত এটিই প্রথম। বলাবাহুল্য রেকাবের ব্যবহার প্রথমে তুর্কীস্তান হতে পারস্যে প্রচলিত হয় এবং পরে সপ্তম শতকের শেষের দিক হতে আরব সমাজে প্রসার লাভ করে।[২০] শিকারীর পরিধেয় বস্ত্র ধূসর সবুজ ও লাল রঙে রঞ্জিত হলেও অশ্ব কালো রঙে চিত্রিত। অঙ্কিত

চিত্রে অশ্বের ছুটন্ত ভঙ্গি এবং হরিণের পলায়নের ধরন যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী ও বাস্তবধর্মী। চিত্রটি প্রাচীন পারসিক মহাকাব্যে বর্ণিত সম্ভবত বাহরাম গুরের শিকারীর দৃশ্যের কথাই স্মরণ করে দেয়। আর শিকারের বিষয়বস্তু স্পষ্টতই সাসানীয়, যা তেহরান কিংবা লেলিনগ্রাদের হারমিটেজ যাদুঘরে রক্ষিত রৌপ্য পট্টিকায় অঙ্কিত চিত্রের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।[২১] নিম্নের শেষোক্ত প্যানেলে সুঠামো দেহধারী একজন পুরুষ সংবলিত একটি প্রাণির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পুরুষের ডান হাতে একটি চাবি এবং তিনি গলায় রশি বাঁধা প্রাণিটিকে বাম হাতে রশি ধরে তালাবদ্ধ হাইরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত গলায় রশি বাঁধা স্থূলদেহী প্রাণিটি রাজকীয় মৃগয়াশালার তথা হাইরকর্মের সার্থক রূপায়ণ। মানবমূর্তির দৈহিক কাঠামো দেখে মনে হয় তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস। আলোচ্য অংশে আরো দুটি প্রাণি — হতে পারে একটি শৃগাল এবং অন্য একটি অস্পষ্ট প্রাণির চিত্র লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য চিত্রটি মুসলমানদের কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বদিকে খলিফার দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধের বিষয়টি প্রতিফলিত করে। আর এভাবে "language of power"-এর আদর্শ হিসেবে তিনি সাসানীয় ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। সমগ্র চিত্রটি আরব্য নকশা সংবলিত পাড় নকশায় আবদ্ধ এবং পশ্চাতভূমি হিসেবে ধূসর রঙের ব্যবহার বিশেষভাবে দৃশ্যমান। উল্লেখ্য যে, চিত্রে আরব্য নকশা সংবলিত নকশাপাড় ব্যবহারের মধ্যদিয়ে পুরোপুরি ইসলামীকরণের আভাস পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত প্রারম্ভিক ইসলামী চিত্রকলায় বিমূর্ত লতাপুষ্প সমন্বয়ে যে অ্যারাবেস্ক নকশার পাড় তৈরি করা হয়েছিল পারসিক চিত্রকলায় বিশেষ করে সাফাভী চিত্রকলায় *হাশীয়া* নামে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে নিজেই একটি চিত্র বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়।

খ্রিষ্টীয় নবম শতকে খলিফা মুতাসিম কর্তৃক নির্মিত জাওসাক আল-খাকানী প্রাসাদ কেবল আব্বাসীয় তথা মুসলিম স্থাপত্যেই নয়, বরং বিশ্ব শিল্পকলার একটি গৌরবময় উদাহরণ। তাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত এ প্রাসাদটি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়। প্রাসাদের চিত্রসমূহের মধ্যে একটি ছবি যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন ও সমালোচকদের দৃষ্টি কেঁড়েছে। চিত্রটি নৃত্যরতা দু-জন রমণীর, যারা উভয়ে লম্বা হাতা বিশিষ্ট কামিজ ও আজানুলম্বিত ঘাঘরা পরিহিত এবং মস্তক বিশেষ ধরনের টুপি দিয়ে আবৃত (চিত্র-৪)। উল্লেখ্য যে, রমণীদের ঠুমকির তাল যথেষ্ট মনোরঞ্জক এবং মুদ্রার ক্রিয়ারূপে ছন্দবদ্ধ। তাদের অবস্থান মুখোমুখী হলেও দৃশ্যটি পার্শ্ব দর্শানো ভঙ্গিতে চিত্রিত এবং ফল ভর্তি একটি ঝুড়ি দ্বারা দুটি অংশে বিভক্ত। এ ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়া পরবর্তীতে মেসোপটেমীয় চিত্রকলার শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। তারা একজন ডান হাতে ও অপরজন বাম হাতে বোতল/কলকি আকৃতির বিশেষ ধরনের পানীয়পাত্র মাথার পিছনে ধরে রেখেছে এবং পেয়ালা সমেত তাদের অপর দুটি হাত আড়াআড়িভাবে উপস্থাপিত। রমণীদের চুল চার খণ্ডে বেণী করে দু-স্কন্ধের সন্মুখ দিয়ে দুটি করে খণ্ড কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বেণীর অপর দুটি করে খণ্ড ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে নিম্নগামী অবস্থায় চিত্রিত। আর বেণীর উৎসস্থল দুটি করে মুক্তার ক্লিপ দিয়ে শক্তভাবে আটকানো। এ ধরনের মুক্তার ক্লিপের ব্যবহার সাসানীয় বয়নশিল্পের এক জনপ্রিয় বিষয়বস্তু।[২২] কানের সম্মুখে সামান্য চুল জুলফির ন্যায় অর্ধ-কুণ্ডলীকৃত। সমগ্র দৃশ্যটি চলমান একটি নৃত্যের বলে মনে হলেও তার মধ্যে একটি নিশ্চল স্থিরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং প্রারম্ভিক ইসলামী চিত্রকলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। পরিধেয় বস্ত্রে হেলেনিস্টিক ভাঁজ পরিলক্ষিত হলেও অনেক ভাঁজই ধাতবাকৃতির অবাস্তব প্রকৃতির, যা পরবর্তীকালে মামলুক চিত্রকলায় দৃশ্যমান। চিত্রটিকে পণ্ডিতগণ কোর্টের একটি বাস্তব চিত্রের রূপক হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এটি পরবর্তীতে নৃত্যচিত্রের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নিশ্চল ও স্থির এ ধরনের চিত্র সপ্তম শতকের শেষার্ধে এবং অষ্টম শতকের প্রথমভাগে নিশাপুরেও চিত্রিত হয়েছিল বলে খননাবিষ্কারের ফলে জানা যায়।[২৩] এতদবিবেচনায় পণ্ডিতগণ এ বৈশিষ্ট্যকে পারসিক বলে অভিহিত করে থাকেন, যা

সাসানীয় রৌপ্য পাত্রে অঙ্কিত চিত্রের অনুরূপ।[২৪] সাধারণভাবে এ চিত্র উমাইয়া আমলের প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের ভাবধারার সম্মিলনে রচিত হলেও চলমান প্রক্রিয়ায় উমাইয়া চিত্রের বাস্তবতা এখানে ফুটে ওঠেনি। অবাস্তবধর্মী এ বিশেষত্ব প্রারম্ভিক ইসলামী চিত্রকলার সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। বলাবাহুল্য কুসাইর আমরার চিত্রের ছিটন অর্ধেক হাতা বিশিষ্ট হলেও এখানে তা পূর্ণ হাতা বিশিষ্ট এবং এ ধরণের পোষাক ইসলামী ভাবাদর্শের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত ইসলাম পূর্ব যুগে *আল-হিরা*র কবিদের রচিত কবিতায় আরব আদর্শ রমণীদের সুডৌল তন্বীদেহীর যে সৌন্দর্যের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে তা এ চিত্রে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।[২৫]

১১৯৯ সনে অঙ্কিত প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাশনালে রক্ষিত মসুল ঘরানায় চিত্রিত *কিতাব আদ-দিরইয়াক*-এর 'প্রাচুর্য দেবী ও সহায়তাকারিনী অন্যান্য দেবী' চিত্রটি অনন্য সাধারণ (চিত্র-৫)। চিত্রের বিষয়বস্তু মূলত পারলৌকিক তথা আধ্যাত্মিকতায়পূর্ণ। দুটি অংশে বিভক্ত আলোচ্য ছবির কেন্দ্রীয়ভাগে বৃত্তাকার কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে মুকুট পরিহিতা রাণীবেশে একজন মহিলার চিত্র অঙ্কিত। তিনি বুদ্ধাসনের ন্যায় বসার ভঙ্গিতে উপস্থাপিত এবং চন্দ্রের ন্যায় একটি চক্র দু-হাতে ধরে রেখেছেন। বুদ্ধাসনে বসার ভঙ্গি উইগুর চিত্রকলার একটি অন্যমত বৈশিষ্ট্য এবং উক্ত চিত্ররীতির প্রভাব পরবর্তীতে উসমানীয় চিত্রকলায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার উভয় পার্শ্বে উপস্থাপিত দু-জন পরিচারিকা হয়তোবা চক্রটি উত্তোলনে তাকে সহায়তা করছে। আর বৃত্তের বাইরে চারকোণে উপবিষ্ট চারজন পাখাবিশিষ্ট দেবী কুণ্ডলিত বৃত্তকে ঘিরে রেখেছে। তাদের হাটু ভাঁজের ভঙ্গি ও অন্যান্য কর্মকুশলতা দেখে মনে হয় যেন তারা কুণ্ডলীকৃত চক্র সমেত রাণীকে শূন্যে উত্তোলনের প্রয়াস চালাচ্ছে। ধারণা করা যায় যে, এরূপ কল্পিত মানবমূর্তি উইগুর তুর্কীদের *মায়াবাদ*[২৬] ও *সর্বপ্রাণবাদ*[২৭] চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভূত এবং দেবদূত হিসেবে চিহ্নিত এ ধরনের পরী বা ডানাসমেত মানবমূর্তি পরবর্তীতে পারসিক ও ভারতীয় চিত্রকলায় বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত কাসর আল-হাইর আল-গারবীর মেঝের ফ্রেসকো চিত্রের সাথে তুলনা করলে রাণী সাজে সজ্জিত কেন্দ্রীয় মহিলার চিত্রটি হয়তোবা কোনো মূখ্য দেবীর হতে পারে, যাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে দু-জন পরিচারিকা ও অন্যান্য দেবী। দেবীদের তুর্কী মুখমণ্ডল, পোষাকপরিচ্ছদ এবং ছবি সামগ্রিকভাবে লাল, হলুদ, সাদা ও সবুজ রঙে রঞ্জিত। তাদের কোমর কোচা বিন্যাস প্রাক-ইসলামী সাসানীয় রীতির কথাই ঘোষণা করছে, যা পরবর্তীকালে পারসিক ও ভারতীয় মোগল চিত্রকলায় ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। তবে মস্তকের পশ্চাতে জ্যোতিচক্রের ব্যবহার বাইজান্টাইন চিত্ররীতির অনুকরণ বলে অনুমিত এবং বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী মেসোপটেমীয় চিত্রশালার সনাক্তকারী বিদ্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এভাবে চিত্রটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভাবধারার সংমিশ্রণে তৈরি ইসলামী চিত্রকলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবার দাবী রাখে। উল্লেখ্য যে, চিত্রের উপরে ও নিচে *কুফী* লিপির উপস্থাপন এবং আরব্য নকশা সংবলিত নকশাপাড়ের ব্যবহার যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক এবং ইসলামীকরণের এক অনন্য প্রয়াস বলেই মনে হয়।

মকামাত-ই-হারীরী পাণ্ডুলিপির ঘটনা অবলম্বনে আল-ওয়াসিতী কর্তৃক ১২৩৭ সনে বাগদাদ ঘরানায় অঙ্কিত 'একজন মহিলা তাড়িত উট পাল'-এর দৃশ্যটি চিত্রকলার ইতিহাসে অতিশয় অভিব্যক্তিপূর্ণ (চিত্র-৬)। চিত্রটি কেবল বস্তুসমষ্টির সুশৃঙ্খল একত্রীকরণই নয়, বরং প্রাণিকুলের প্রতি গভীর মমত্ববোধের এক অনন্য উদাহরণ। চিত্রে উটগুলোকে সারিবদ্ধভাবে এক লাইনে উপরে-নীচে ঘন করে উপস্থাপনপূর্বক অভিনব দৃশ্যপটের অবতারণা করা হয়েছে, যা শিল্পকলার ইতিহাসে একটি নতুন রীতির জন্ম দিয়েছে। আর এ নবীন শৈলীই পরবর্তীতে পারসিক চিত্রকলার সর্বজনীন রীতিতে পরিণত হয়। সারিবদ্ধ উটের মধ্যে দুটি আবার মাথা নিচু করে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করছে। এটি ব্যাঙ্গাত্মক ও অনানুষ্ঠানিক চিত্রের এক উজ্জ্বল

নিদর্শন। অনেক সময় দলের যে সকলে কথা শুনে না — দু-একজন যে ব্যতিক্রম হয় চিত্রটি তারই বাস্তবধর্মী রূপায়ণ। অধুনা সমাজে দলীয় শৃংখলা বোধ ও সংহতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এ ধরনের নীতিজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড অহরহ লক্ষ্য করা যায়। চিত্রে অঙ্কিত উটের ছবি এবং চিত্রের গতিশীল স্বাভাবিকতা আনয়নের প্রচেষ্টা ও গভীরতা সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জীবজগতের ইতিহাসে উট সাধারণত কুৎসিত আকৃতির প্রাণি বলে চিহ্নিত হলেও চিত্রকর উটের সুসামঞ্জস্যময় গ্রীবা অঙ্কনে এবং মুখভঙ্গি ও রঙের বৈচিত্র্যে যে ছন্দময়তা সৃষ্টি করেছেন তা যে কোনো চিত্রমোদীকে বিমোহিত করে। চিত্রে মধ্যবয়সী একজন মহিলা পালকের প্রতিকৃতি আরবীয় কায়দায় অঙ্কিত হয়েছে। বোরকা পরিহিতা মহিলার মাথা লাল রঙের উড়নিতে আবৃতকরণ চিত্রটিকে আরবীয়করণের প্রয়াস ও আরব সমাজচিত্রের সার্থক প্রতিফলন বলেই অনুভূত হয়। ভ্রমণকারী মহিলার অবগুণ্ঠন এটিই নির্দেশ করে যে, রাজদরবারের বাইরে কিংবা সমাজের নিম্নস্তরের মহিলারা কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা প্রতিপালন করতেন।[২৮] তার ডান হাতে যষ্টি ও বাম হাত সামনের দিকে প্রসারিত ভঙ্গিমায় চিত্রিত। দেখে মনে হয় যেন তিনি দু-হাতে পশুগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করছেন। চিত্রে বোরকা ও উড়নির ব্যবহার আরব পোষাকপরিচ্ছদের রূপায়ণ। আর জামার হাতায় যে বন্ধনী পরিলক্ষিত হয় তা আরব বা তুর্কী এবং প্রাথমিক ইসলামী চিত্রকলার মসুল ও পরবর্তীতে বাগদাদ ঘরানার প্রায় সমুদয় চিত্রে অনুরূপ বন্ধনীর ব্যবহার দৃশ্যমান। তাছাড়া বন্ধনীযুক্ত হাতা বিশিষ্ট এ জামাকে মুসলিম জামায় রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিবলিওথেক ন্যাশনাল প্যারিসে সংরক্ষিত ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে ১২৩৭ সনে রচিত 'একজন ভারতীয় প্রসবিনীর প্রসবকালীন দৃশ্য' চিত্রটি সমসাময়িক তথা বর্তমান সমাজ জীবনের অত্যন্ত বাস্তবধর্মী একটি চিত্রায়ণ (চিত্র-৭)। গৃহাভ্যন্তরে চিত্রিত এরূপ একান্ত গোপনীয় চিত্র মধ্যযুগীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অতুলনীয়, অবর্ণনীয় ও একক উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। বর্তমান প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাশনালে সংরক্ষিত মসুল ঘরানার *কিতাব আল-দিরইয়াক* সর্প দংশন চিত্রের ন্যায় আলোচ্য চিত্রটি দুটি প্যানেলে বিভক্ত এবং এ বিভাজন প্রক্রিয়া ইরাকী ও সিরীয় চিত্রকলার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে পূর্বের চিত্রের তুলনায় এখানে রঙের প্রাচুর্যতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। দুটি প্যানেলের মধ্যে নিম্নাংশে মহিলার প্রসবের দৃশ্য এবং উপরের অংশে হয়তোবা তার স্বামী স্ত্রীর মঙ্গল কামনায় ধ্যানে নিয়োজিত। একজন পরিচারিকার স্কন্ধে ভর করে প্রসবিতা মহিলা যেভাবে দাইকে প্রসবে সহায়তাকারীর ভূমিকায় নিজেকে অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রসব বেদনা সহ্য করছেন তা প্রসবকালীন বাস্তবতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অপরপক্ষে দাইও স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে মহিলাকে যেভাবে প্রসবকর্মে সহায়তা করছেন তা যথেষ্ট উপভোগ্য এবং দৃশ্যটি প্রকৃত বিয়ন্ত ঘটনার এক অনন্য উদাহরণ (a true symbol of fertility)। চিত্রে প্রসবিত্রীর উভয় পাশে দু-জন মহিলা তাদেরকে প্রয়োজনীয় আরো সহায়তা দানের জন্য প্রস্তুত, যাদের একজন ধূপদানি হাতে দণ্ডায়মান। তাদের আজানুলম্বিত পরিধেয় বস্ত্র বাসন্তি রঙে রঞ্জিত এবং মূখাবয়বের মধ্যে একটি উদ্বিগ্নের ছাপ প্রস্ফুটিত। উপরের চিত্রে জপে নিমজ্জিত স্বামীর পশ্চাতে দু-জন মহিলা ঘটনাটিকে গভীরভাবে উপলবদ্ধি করার চেষ্টা করছে। বর্ণিত এ চিত্রের সকল চরিত্রই ভারতীয়। তবে সাধু স্বামীর দু-পাশে যে দু-জন ব্যক্তির চিত্রাঙ্কিত হয়েছে তারা উভয়ই আরব জাতিগত মানুষ — যথাক্রমে আবু যায়েদ যিনি তাবিজ লিখনীর কাজে ব্যাপৃত এবং আল-হারীরী যিনি মোনাজাতে মগ্ন।[২৯] অনুমিত হয় যে, তারা উভয়ে কোনো এক সময় ভারতীয় জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুগ্রহভাজন ছিলেন এবং এ দেশে তাদের অবস্থানকালীন সময়ে দৃশ্যটির অবতারণা হয়ে থাকতে পারে। ভারতীয়দের চিত্রায়ণে সাধারণত ধূসর রং ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এতদঞ্চলের মানুষ শংকর জাতিভুক্ত। আর ভিনদেশী হওয়ায় সম্ভবত চিত্রকর হারীরী ও যায়েদের প্রতিকৃতি চিত্রায়ণে লালচে সাদা রঙ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া চিত্রে স্থাপত্যিক নকশার প্রতীকী উপস্থাপন এ ধারণা দেয় যে, হয়তোবা ভারতীয়

দালানকোঠা সম্পর্কে আল-ওয়াসীতীর তেমন কোনো ধারণা ছিল না। তিনি কেবল শ্রবণগোচর কিংবা বর্ণনীয় ধারায় প্রাসাদের চিত্রাঙ্কণ করে থাকতে পারেন। প্রসঙ্গত ইমারত চিত্রায়ণে কয়েকটি খুঁটি, খিলান ও বপ্রসমেত গম্বুজ এবং আরব্য নকশা সংবলিত পর্দা অঙ্কন করা হয়েছে। আরব্য নকশার বিমূর্ত চিত্রসমূহ পর্দাগুলোকে ইসলামী ভাবধারায় রূপায়িত করেছে এবং বপ্রে যে আরব্য নকশার ছবি অঙ্কিত হয়েছে তা সময়ানুপাতিক চিত্রে অসাধারণ। এটিংহাউসনের মতে, চিত্রের প্রতিসম বিন্যাস ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের সম্মুখদর্শানো ভঙ্গি এবং অংশগ্রহণকারী চরিত্রের নিশ্চল দেহভঙ্গিমা পারসিক রাজকীয় রীতির যথার্থই প্রতিফলন।[৩০] উল্লেখ্য যে, পটভূমিবিহীন নিশ্চল ও নিরস মেসোপটেমীয় চিত্রকলার এ দুর্বলতাকে দূরীভূত করে পরবর্তী ইসলামী চিত্রকলায় পটভূমি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধনে প্রাণবন্ত ছবির উদাহরণ পাওয়া যাবে।

ভ্যাটিকান বিবলিওতেকা আপোসতালিকায় সংরক্ষিত ত্রয়োদশ শতকে স্পেন কিংবা মরক্কোতে চিত্রিত *বায়াদ-উ-রিয়াদ* পাণ্ডুলিপি প্রেক্ষাপটে 'বায়াদের নিকট রিয়াদের চিঠি হস্তান্তর' চিত্রে বায়াদের বিরহকাতর মনের ভাব ফুটে উঠেছে (চিত্র-৮)। ভাবমগ্ন বায়াদ নদীর তীরে নির্জনে বসে থাকা অবস্থায় রিয়াদের পরিচারিকা শামূল একটি চিঠি নিয়ে আসে। আলোচ্য চিত্রে দুটি বিশেষ দৃশ্য লক্ষণীয় — শামূল ডান হাতে গায়ের চাদর দিয়ে তার মুখাবয়ব ঢেকে রাখার চেষ্টারত এবং বাম হাতে বায়াদের নিকট চিঠি হস্তান্তর করছে। এখন প্রশ্ন হলো কেন পত্রবাহক মুখ ঢেকে রেখেছে? এবং কেনইবা বাম হাতে চিঠি প্রদান করছে? প্রথম প্রশ্নের প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, এর মাধ্যমে বাস্তবধর্মী সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যার একটি নিজের পরিচয় গোপন করা এবং অন্যটি মহিলারা যে সাধারণভাবে সমাজের পরপুরুষদের মুখোমুখী হতো না তারই বহিঃপ্রকাশ। অধুনা গ্রামীণ সমাজে পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে মহিলাদের বহিরঙ্গণে বিচরণের এহেন দৃশ্য প্রয়াস চোখে পড়ে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, প্রেমকাহিনী সর্বযুগে সামাজিকভাবে একটি নিন্দনীয় কাজ — বাম হাতে চিঠি প্রদানের মাধ্যমে তারই বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এ ধরনের প্রেমের ঘটনা কোনো যুগেই সমাজ স্বীকৃত ছিল না — এখনো নয়। শামূলের চোখে সমবেদনার প্রকাশ চিত্রটিকে তৎক্ষণাত প্রেম চিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বায়াদের *বারবার* মুখাবয়ব ও ভারিক্কি ধরনের মাথার পাগড়ী মাগরেবীয় চিত্রকলার বিশেষ শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া ইমারতের নকশা চিত্রায়ণে পলেস্তারবিহীন লাল ইটের ব্যবহার, কৌণিক চূড়া বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন, অশ্বখুরাকৃতির খিলান, *মাশরাবীয়া* বা *লাসেরীয়া* গ্রন্থীযুক্ত জানালা ও প্যারাপেট, বলিষ্ট লিপি নকশার ব্যবহার প্রভৃতি সমকালীন স্পেনীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের কথাই ঘোষণা করছে। এছাড়া ইমারতের পশ্চাতে অঙ্কিত বৃক্ষ ও নদীর চিত্রায়ণ মেসোপটেমীয় চিত্রশালার প্রথাগত বৃক্ষ ও নদীর চিত্রের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। আর বাসন্তী ও সবুজ রঙের আধিক্যতা চিত্রটি যথার্থই প্রেম চিত্রের এক অনন্য রূপায়ণ। অপর দুটি চিত্র একে অপরের পরিপুরক — একটি চিত্রে বায়াদ উদ বাজিয়ে গান গাইছে এবং তার সামনে রিয়াদ ও তার সহচরবর্গ একাগ্রচিত্তে সে গান শুনছে।[৩১] ঠিক একইভাবে রিয়াদ উদ বাজিয়ে বায়াদ ও তার সহচরীদের গান শুনাচ্ছে। উভয় চিত্রের সহচারী নারী চরিত্র কেবলই আলংকারিক ও সমভিব্যাহারী উপাদান হিসেবে উপস্থাপিত এবং রিয়াদের মাথার মুকুট স্বীয় আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য যে, চিত্রগুলো আরব চিত্রকলায় প্রেমকাহিনীর অনন্য রূপায়ণ হিসেবে স্বীকৃত, যা পরবর্তীতে পারসিক শাসনামলে আরো বিস্তৃতরূপে ইসলামী চিত্রকলার অবিচ্ছেদ বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

পারসিক চিত্রকলায় নারী চরিত্র

ইউরোপসহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিবরণীতে উল্লেখিত 'Persia'-এর বাংলা রূপ পারস্য শব্দটি ক্লাসিক্যাল পার্সিস (Persis) থেকে উদ্ভূত, যা অ্যাকিমেনীয় শাসকগোষ্ঠীর জন্মভূমি তৎকালীন পার্সা (Parsa) প্রদেশকে নির্দেশ করে (বর্তমান ইরানের ফার্স প্রদেশ) এবং সমগ্র ভূখণ্ড এমনকি এর অধিবাসীদের বুঝাতে

পরিভাষাটি সাধারণভাবে বহুল প্রচলিত ছিল। আর ফার্‌সি (Farsi) ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী পারসিক জাতি হিসেবে অভিহিত। উল্লেখ্য যে, পার্‌সি (Parsi) পারসিক শব্দ হলেও ফার্‌সি পারসি শব্দের আরবীরূপ।[৩২] যাহোক পশ্চিমা বিশ্বের নিকট পারস্য বলতে ঐতিহাসিকভাবে ইরানের সাধারণ নামকে বুঝায়। কিন্তু পশ্চিমাদের পারস্য তথা ইরান এবং প্রাচীন পারস্য দেশ বলতে একই ভূখণ্ডকে নির্দেশ করে না। বরং মহান সাইরাস কর্তৃক খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে পশ্চিম এশিয়া ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ইরানীয় সাম্রাজ্য তথা পারসিক অ্যাকিমেনীয় সাম্রাজ্য আধুনিক ইরানকে কেন্দ্র করে পশ্চিমে ইরাক, উত্তরে মধ্য এশিয়ার কিয়দংশ এবং পূর্বে আফগানিস্থানসহ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিয়ে গড়ে উঠেছিল।[৩৩] সভ্যতার ইতিহাসে অ্যাকিমেনীয়দের অবদান অপরিসীম।[৩৪] অতঃপর খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৮ অব্দে গ্রীক সত্রাপ (Satrap)[৩৫] বা নামমাত্র মেসিডোনীয় রাজ্যভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের ধ্বংসাবশেষের উপর পার্থীয় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে এবং খ্রিষ্টীয় ২১১ সন পর্যন্ত এদের শাসনকাল স্থায়ী ছিল। সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাদের অবদানকেও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।[৩৬] পার্থীয়দের পরবর্তী শাসক সাসানীয় আমলে (২১১-৬৩৭) অ্যাকিমেনীয় পারস্যের হৃত গৌরব পুনর্জ্জীবিত হয়। পারস্যের সামগ্রিক ইতিহাসে সাসানীয় সাম্রাজ্য এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় তাদের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়।[৩৭] উল্লেখ্য যে, প্রাক-ইসলামী পারস্য তথা প্রাচীন পারসিক ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল পাহলভী। কিন্তু ৬৩৭ সনে খলিফা ওমরের শাসনামলে (৬৩৪-৪৪) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সফল বিজয়াভিযানের মাধ্যমে এতদঞ্চল ইসলামী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে পারস্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজেদের সুবিধার্থে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সাসানীয় ঐতিহ্যকে ইসলামী আবরণে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছিল। ফলে সাসানীয় সংস্কৃতি আরবীকৃত রূপে আরব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মিশ্র এক নতুন সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। এ মিশ্র নতুন সভ্যতাই ইসলামী সভ্যতার পারসিক রূপায়ণ।[৩৮]

উল্লেখ্য যে, মুসলিম পারস্যে পাহলভী ভাষার পরিবর্তে আরবী রাষ্ট্রীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়। তবে রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী হলেও আরব বেদুঈনদের থেকে পারসিক মুসলমানরা স্বীয় চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারে বিশেষ স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। ফলে পারসিক-আরবরূপের পরিবর্তে নতুন এক পারসিক-তুর্কীরূপের উদ্ভব ঘটে। এ নতুন পার্সো-তুর্কীরূপের জন্মদাতা হলো তুর্কীস্তান থেকে আগত তুর্কী সম্প্রদায় এবং আরবী বর্ণের ধারায় লিখিত তুর্কীদের এক নতুন ভাষার নাম ফার্‌সি। সামানীয় (৮৭৪-৯৯৯) ও গজনভী (৯৬০-১১৮৬) সুলতানগণ ফার্‌সি ভাষার উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং রূদাগী ও দাদিকী ছিলেন এ ভাষার জনক।[৩৯] খ্রিষ্টীয় দশম শতক থেকে এ ভাষা পারসিক ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং পারস্য সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আরবী ভাষার সমান্তরালে ফার্‌সি ভাষায় রচিত ও গ্রথিত হতে থাকে। সামানীয় ও গজনভীদের পরে সেলযুক আমলে (১০৩৭-১১৯৪) সমগ্র পারস্য রাজনৈতিকভাবে পুনরায় একীভূত হয়ে পারসিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে এবং প্রচণ্ড এক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এ রাজনৈতিক শক্তি ইতিহাসের কালপরিক্রমায় নবীন ধারায় উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তীতে মোঙ্গল (১২৫৬-১৩৩৫), তৈমুরীয় (১৩৭০-১৫০১) ও সাফাভী রাজবংশ (১৫০১-১৭৩৬) নামে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তাদের শাসনকাল টিকে ছিল। আর ভাষাগত ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে রচিত পারস্যবাসীর যে ইতিহাস তাই সামগ্রিকভাবে পারসিক ইতিহাস এবং শিল্পকলার জগতে পারস্য বা পারসিক চিত্রকলা নামে পরিচিত। কিন্তু বিভাজিত অর্থে বংশীয় নামানুসারে ইলখানী চিত্রকলা, জালাইর চিত্রকলা, ইন্‌জু চিত্রকলা, মোযাফ্‌ফরীয় চিত্রকলা, তৈমুরীয় চিত্রকলা, সাফাভী চিত্রকলা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। পারসিক শাসকবর্গের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় আল-বেরুণীর *আছার আল-বাকিয়া*, ফেরদৌসীর *শাহনামা*, রশীদ উদ-দীনের *জামি আত-তাওয়ারীখ*, নিযামীর *খামসা*, খাজুওয়া কিরমানীর *দীওয়ান*, ইস্কান্দার সুলতানের *সংকলন গ্রন্থ*, শরাফ উদ-দীন আলী ইয়াযদানীর *যাফরনামা*, ইবনে বকতিশূর *মানাফি আল-হায়ওয়ান*, সাদীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান*, নিশাপুরীর *কিসাস আল-আম্বিয়া* প্রভৃতি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয় এবং

কামালউদ্দীন বিহযাদ, রিজা-ই-আব্বাসী, খাজা আব্দুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলী প্রমূখ জগৎ বিখ্যাত চিত্রকরদের রঙ-তুলীর স্পর্শে মুসলিম চিত্রকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, এ সময়ের প্রথিতযশা চিত্রকর হলেন কামালউদ্দীন বিহযাদ ও রিজা-ই-আব্বাসী। যুগের বিস্ময় বিহযাদ প্রাচ্যের রাফায়েল হিসেবে সুপরিচিত এবং রেখা চিত্রাঙ্কণ ও প্রতিকৃতি চিত্রায়ণে আকা রিজার শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

জালাইর আমলে ১৪০৫-১০ সনে চিত্রিত ওয়াসিংটন ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্টে সংরক্ষিত নিযামীর *খসরু-শিরীন* কাব্যে 'ফরহাদকে শিরীনের সামনে আনয়ন' চিত্রটি মূলত দুটি প্যানেলে বিভক্ত (চিত্র-৯)। উল্লম্বাকারে রচিত এ চিত্রের উপরিভাগের প্যানেলটি ছাদ আকৃতি, যার উপরে একটি মোঙ্গল প্যাভিলিয়নে চারজন মহিলার প্রতিকৃতি দৃশ্যমান। প্যাভিলিয়নের নিম্নাংশে দুটি জানালার মধ্যদিয়ে একজন করে মহিলা নিচের দিকে অবাক বিস্ময়ে শিরীন ও ফরহাদের মিলনদৃশ্য অবলোকন করছে। পটভূমিতে সমউচ্চতা সম্পন্ন তিনটি ইওয়ান সদৃশ্য দরজার চিত্রায়ণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় ইওয়ানের নিম্নে অনিন্দ্য সুন্দর নকশায় সুশোভিত কার্পেটের উপর দণ্ডায়মান শিরীন ফরহাদের আগমনে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রং-তুলীর মাধ্যমে চিত্রকর তা অবিনশ্বর করে রেখেছেন। পাশের দরজার সন্মুখে রাজকুমারী শিরীনের পরিচারকবৃন্দ, যাদের মধ্যে কেউবা দাঁড়িয়ে, আবার কেউ কেউ বসার ভঙ্গিতে চিত্রিত। তাদের ডিম্বাকৃতির মুখাবয়ব, লম্বিত সুডৌল দৈহিক অবকাঠামো ও পরিধেয় আলুলায়িত দীর্ঘ পোষাক পারসিক চিত্ররীতির ছাপ বহন করছে। আর ফরহাদকে আনয়নের কাজে নিয়োজিত পুরুষ অনুচরবৃন্দ সকলেই দণ্ডায়মান অবস্থায় চিত্রিত। আলোচ্য চিত্রে পটভূমি ও ঘটনার মধ্যে যে সামঞ্জস্যতা প্রকাশ পেয়েছে তা পরবর্তী চতুর্দশ শতকের পারসিক (তৈমুরীয় ও সাফাভী) চিত্রকলার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রূপে অনুসৃত হয়েছে।

বাল্টিমোর ওয়াল্টারস আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত ১৩৪১ সনে শীরাযে চিত্রিত *শাহনামা* পাণ্ডুলিপির প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত 'মহিলা কর্তৃক গাভীর দুগ্ধ দোহন' চিত্রটি ইনজু আমলে একটি প্রতিনিধিত্বকারী উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত (চিত্র-১০)। চিত্রে দুগ্ধ দোহনরত মহিলা ও দণ্ডায়মান অপর দু-জন নারী চরিত্র সকলেই মোঙ্গল। তাদের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ করে আজানুলম্বিত ফুল হাতা ছিটন বিশিষ্ট বোরকা ও মাথায় স্কার্ফ দিয়ে আবৃতকরণ চিত্রটিকে ইসলামীকরণের এক অভিনব প্রচেষ্টা বলেই অনুমিত হয়। চিত্রকর এ দৃশ্য চিত্রায়ণে দূরপ্রাচ্যের উপকরণ সংযোজন করলেও প্রাকৃতিক পটভূমিতে পারসিক বৈশিষ্ট্য ফুটে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রসঙ্গত লতাপাতা সমেত কুফি লিপি, স্থাপত্যিক নিদর্শন, আলংকারিক রীতিতে দৃশ্যের রূপায়ণ, পোষাকপরিচ্ছদের নকশাবলী, উজ্জ্বল রং প্রভৃতি পারসিক রীতির পরিচায়ক হলেও বৃক্ষ, শিরোভূষণ ও সূক্ষ্ম রেখাঙ্কণের কৌশলের মধ্যে দূরপ্রাচ্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, গাভীর সংবেদশীল, জীবন্ত ও দৃঢ় চিত্রায়ণ প্রাচীন পারসিক ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করে দেয়।[৪০] চিত্রে মহিলা কর্তৃক গাভীর দুগ্ধ দোহন ভারতবর্ষের অধুনা সমাজে বিশেষভাবে দৃশ্যমান ও বহুল প্রচলিত। ঠিক একইভাবে *দীওয়ান-ই-খাজুওয়া কিরমানী*র ঘটনা প্রেক্ষাপটে ১৩৯৬ সনে বাগদাদে চিত্রিত 'রাজকুমারী হুমায়ূনের প্রাসাদে রাজকুমার হুমাঈয়ের আগমন' এবং রাজকুমারী শিরীনের ভবনে খসরুর উপস্থিতি চিত্র দুটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর এক অসাধারণ চিত্রায়ণ। প্রথম চিত্রে ত্রিতল বিশিষ্ট উদ্যান প্রাসাদের নায়িকা হুমায়ূন দ্বিতীয় তলার ছাদে দাঁড়িয়ে নিম্নে হুমাঈয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। এ চিত্রে নায়িকার লম্বা গ্রীবা ও মাথা নুয়ানোর ভঙ্গিমা পরবর্তী তৈমুরীয় ও সাফাভী চিত্রকলার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তদরূপ দ্বিতীয় চিত্রে বাগানসমেত ত্রিতল ভবনের গম্বুজ বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন সদৃশ দ্বিতীয় তলার জানালা দিয়ে রাজকুমারী শিরীন নিচে অপেক্ষমান প্রেমিক খসরুকে অবলোকন করছে। আর দালানের অপর দুটি জানালার মধ্যে একটি দিয়ে দু-জন এবং অন্যটি দিয়ে তিনজন সঙ্গী সমগ্র প্রেমের

ঘটনাটি উপলব্ধি করার চেষ্টায়রত। অবশ্য শিরীনের কক্ষে অপেক্ষমান অপর একজন মহিলা ঘটনাটি সম্পর্কে তাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য যে, দুটি চিত্রের মূল আকর্ষণ তাদের অন্তর্নিহিত রোমান্টিকতা। অথচ এ রোমান্টিকতা দর্শাতে গিয়ে মূল ঘটনার চেয়ে পারিপার্শ্বিকতাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও পারিপার্শ্বিকতা ও রোমান্স পরস্পর নির্ভরশীল, তথাপিও এ দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে পরবর্তী পারসিক বিশেষ করে ভারতীয় মোগল চিত্রকলায় তা পরিহার করা হয়েছে, যা মুসলিম চিত্রকলার এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শীরায চিত্রশালায় ১৪১০ সনে চিত্রিত ইস্কান্দার সুলতানের *সঙ্কলন* গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হলো 'উঁকি মেরে ইস্কান্দারের জলকুমারী দর্শন' (চিত্র-১১)। চিত্রটিকে শীরায ঘরানার একটি উৎকৃষ্টতম ছবি হিসেবে গণ্য করা যায়। মাশরুম আকৃতির পাহাড়ের পশ্চাত থেকে ইস্কান্দার ও তার সহযোগীদের হ্রদে বিনোদনরত জলকুমারীদের অবলোকন করে আনন্দ উপভোগ করছে। জলকুমারীদের স্বচ্ছন্দময় ও অনিবার্য উপস্থিতি এবং স্কার্ট পরিহিত তাদের অঙ্গভঙ্গি চিত্রটিকে প্রকৃতপক্ষেই বিনোদনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তবে ইস্কান্দার ও তার সহযোগীদের উঁকি মেরে জলকুমারীদের দর্শন সত্যই চিত্রটিকে রোমান্টিকতার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া পশ্চাতে বিস্তীর্ণ গাঢ় নীল আকাশে সোনালী তারকা ও পাহাড়ের বিচিত্রবর্ণ – সব কিছু মিলে এ চিত্রটি শীরায ঘরানার একটি আদর্শ স্থানীয় চিত্ররূপে পরিগণিত করেছে। জলকেলীরত বালিকাদের শিশু সুলভ অঙ্গভঙ্গির সাথে পানির চিত্রায়ণ এবং পাহাড়ের পশ্চাত থেকে ইস্কান্দার ও তার সহযোগীর উকি মেরে জলকুমারীদের দর্শন যথেষ্ট কৌতুহলী ও রহস্যময়। তবে চিত্রিত মহিলাদের দৈহিক অবয়ব চিত্রায়ণে যথেষ্ট দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ তন্বী-তরুণীদের দৈহিক কাঠামো অঙ্কনে চিত্রকর অপরিপক্কতার পরিচয় দিলেও কুহকিনী রমণীদের অভিব্যক্তিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি ও ইস্কান্দারের সশ্রদ্ধ অভিভূতি চিত্রণের মাধ্যমে চিত্রকর নিখুঁত রোমান্টিক আমাজের অবতারণা করেছেন।

পারসিক তথা মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাসে ১৪২২ সনে তাব্রিযে চিত্রিত ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত *কালিলা ওয়া দিমনা* পাণ্ডুলিপির মিনিয়েচারগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং চিত্রগুলো সাবলীল, প্রাণচাঞ্চল্য ও গীতিকাব্যের অনুভূতিতে ভরপুর। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির দুটি চিত্র যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও পশ্চাদভূমি দৃশ্যায়নে নান্দনিকতায় অতুলনীয়। চিত্র দুটি যথাক্রমে একটি 'হত্যার চেষ্টা ব্যাহত' ও অপরটি 'শয্যাকক্ষে ধৃত চোর' (চিত্র-১২)। প্রথম চিত্রের বাম দিকের উপরে একটি বেলকনি ঘেসে একজন অধিবাসীর নিম্নমুখী চাহনি অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যের সাথে বাইরের সংযোগের প্রত্যক্ষ চিত্রায়ণ বলেই মনে হয়। আলোচ্য চিত্রে শস্যা কক্ষে চাদর মোড়ান অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে আলিঙ্গনরত যুগল চরিত্র অঙ্কিত। কক্ষের অভ্যন্তরে দৃশ্যটি দেখে অপর একজন মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টারত। সমগ্র দৃশ্যটি পারসিক টালী ও কার্পেট নকশায় সজ্জিত। তবে চিত্রে ফ্যাকাশে নীলাভ রঙের আভাস চৈনিক চিনামাটি '*ch'ing-pai* or *ying-ch'ing* '-এর কথাই জানান দেয়।[৪১] আর দ্বিতীয় চিত্রের মূখ্য বিষয়বস্তু একটি দম্পতির শয্যাগৃহে রাতের আঁধারে চুরি করতে গিয়ে গৃহকর্তা কর্তৃক চোরকে বন্দীকরণ ও প্রহৃত হওয়ার দৃশ্যটি যথেষ্ট বাস্তবধর্মী এবং মধ্যযুগীয় তথা আধুনিক সমাজচিত্রের এক অনন্য উদাহরণ। এ ছবির মূল আকর্ষণ খাটিয়ায় হেলানরত নিদ্রাভঙ্গ স্ত্রীর প্রতিকৃতি। ফুলহাতা নিশিবসন পরিহিত রমণী অবাক বিস্ময়ে ঘটনাটি অবলোকন করছে এবং তার চাহনির মধ্যে আতংকের ভাব বিরাজমান। আর বিভিন্ন রঙের যেমন- নীল আকাশ, সোনালী বাগান ও লোহিত বর্ণের বিছানার আচ্ছাদনে চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ শিল্পনৈপুণ্যের এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। চিত্রে পারসিক ক্লাসিক শিল্পরীতির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ দৃশ্য দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অনুরূপ চিত্র পরবর্তীতে মোগল আমলে চিত্রিত *আনওয়ার-ই-সুহাইলী*তে (১৫৪০) বিশেষভাবে

পরিদৃষ্ট হয়।[৪২] প্রসঙ্গত গৃহাভ্যন্তরে অঙ্কিত ঘটমান দৃশ্য দুটি স্থাপত্য নকশা ও ফুল-লতাসমেত চৈনিক বৃক্ষের আবরণে গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা জালাইর চিত্রকলার অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। উভয় চিত্রে স্থাপত্যিক ইমারত চিত্রায়ণে বিশেষ করে প্রথম চিত্রের জানালা ও দ্বিতীয় চিত্রের উল্লম্ব টাওয়ার সদৃশ্য উপকরণ অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং পরবর্তীতে হেরাত ঘরানায় বিহযাদের যাদুর স্পর্শে স্থাপত্য নকশা বাস্তবধর্মী ও সার্থকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চিত্রে অঙ্কিত বৃক্ষসমূহ এতো লম্বিত যে কম্পোজিশন ফ্রেম অতিক্রম করে আকাশের দিকে ধাবমান এবং আকাশে বক্র সাদা মেঘমালা চিত্রায়ণে অনুরূপ ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৫৮০ সনে রচিত নিউইর্য়ক মেট্রোপলেটিন মিউজিয়ামে রক্ষিত স্নানরত মহিলাদের নিয়ে *হাফত পাইকার* কাব্যের একটি কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। চিত্রে নগ্ন আবক্ষে কয়েকজন মহিলা একটি স্নানাগারের চৌবাচ্চায় স্নানরত এবং বীণা হাতে একজন রমণীর চিত্র সঙ্গীত পরিবেশনের ভঙ্গিমায় অঙ্কিত। আলোচ্য চিত্রে স্নানাগারের কথিত মালিক প্রাসাদের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তাদের অবলোকন করছেন। উল্লেখ্য যে, উন্মুক্ত জলাশয়ে স্নানরতা মাহিলাদের দৃশ্য ইতোপূর্বে চিত্রিত হলেও অভ্যন্তরীণ স্নানাগারের চিত্র শীরায ঘরানায় সম্ভবত প্রথম। পরবর্তীতে হেরাতের চিত্রশিল্পীগণ সুন্দর পরিপাটি ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ স্নানাগার দৃশ্য চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন এবং বিহযাদ কর্তৃক ১৪৯৫ সনে অঙ্কিত বর্তমান ব্রিটিশ লাইব্রেরী লণ্ডনে সংরক্ষিত 'একজন বৃদ্ধার সঙ্গোপনে জলকুমারীদের অবগাহন দর্শন' চিত্রটি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ (চিত্র-১৩)।[৪৩] এ ধরনের দৃশ্যাঙ্কণ তৈমুরীয় চিত্রকলার এক জনপ্রিয় বিষয়বস্তু, যা শিল্পীদের প্রচলিত ইসলামী রীতিনীতির বিপরীতে একটি হালকা চিত্তে অর্ধ-নগ্ন মহিলাদের চিত্রিত করার সুযোগ করে দিয়েছে। এ সময়ের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী বিশেষ করে বিহযাদ প্রচলিত দরবারী দৃশ্যের পরিবর্তে লৌকিকতাবর্জিত এ ধরনের বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত জলকুমারীদের বাস্তবধর্মী প্রফুল্লময় অঙ্গভঙ্গি নতুন রীতির সূচনা করলেও চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য নকশার চিত্রায়ণ প্রথাগত বিহযাদীয় রীতির পরিচায়ক।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে হেরাত চিত্রশালায় অঙ্কিত *দীওয়ান-ই-খাওয়াজু কিরমানী* পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে চিত্রিত বর্তমানে প্যারিস মিউজে দ্য আর দেকোরাতিফে সংরক্ষিত 'চৈনিক উদ্যানে প্রিন্সেস হুমায়ূন কর্তৃক প্রিন্স হুমাঈকে অভ্যর্থনা' দৃশ্যটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং নান্দনিকতার বিচারে অতুলনীয় ও প্রাণস্পর্শী (চিত্র-১৪)। চিত্রে অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে একজন পুরুষ, যিনি নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং বাঁকি তিনজন মহিলার প্রতিকৃতি উপস্থাপিত হয়েছে। চিত্রের চরিত্রসমূহের গোলাকার মুখমণ্ডল, বিভিন্ন রঙের কারুকার্য খচিত অথবা সাধারণ দীর্ঘায়িত পোষাক, সুডৌল দেহভঙ্গি, পটভূমি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রভৃতি চিত্রায়ণে শিল্পীর অপূর্ব সৃজনশীল দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মহিলারা নানা বর্ণের যেমন- লাল, হলুদ ও কালো রঙের হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত বসন পরিহিত। সহযোগী চরিত্রের পোষাকের ছিটন হাফ হাতা হলেও রাজকুমারীর জামা ঢিলাঢালা ফুল হাতা বিশিষ্ট এবং নীল রঙের উড়না ও কটি পরিহিত। রাজকুমারী হুমায়ূনের মাথার সোনালী রঙের মুকুট তার বিশেষত্ব প্রকাশ করছে। আর সহযোগী নারীদের একজন দু-হাতে এবং অপরজন বাম হাতে পেয়ালা সদৃশ বিশেষ ধরনের পাত্র ধরে আছে। প্রতিকৃতিগুলোর পরিধেয় শিরোভূষণ, পোষাকে রিবনের প্রয়োগ, মুখভঙ্গিতে চীনা প্রভাব থাকলেও চিত্রটি মূলত হেরাত ঘরানার ক্লাসিকাল চিত্রকলার অন্যতম নিদর্শন। আর পটভূমি রচনায় মালভূমিতে বৃক্ষসমেত ফুল, লতাপাতা ও ঝর্ণাধারা চিত্রায়ণের মাধ্যমে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের অবতারণা করা হয়েছে। অর্থাৎ মন্দাকিনী স্রোতের ন্যায় পাহাড় হতে নিম্নাঞ্চলে প্রস্রবণের প্রবাহমান ধারা এবং এর উভয় তীরে ফুলসমেত বৃক্ষ ও লতাপাতা, কার্পেট সদৃশ ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হুমাঈ ও হুমায়ূনের ভাবাবেগপূর্ণ দৃশ্য হতে দৃষ্টি রোমাঞ্চকর প্রাকৃতিক চিত্রপটে ফিরে নেয়ার এক অনন্য প্রয়াস। বললে

অত্যুক্তি হবে না যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতিতে তাঁর মহিমা দীপ্তিমান হয়ে রয়েছে — এ ধারণার বশবর্তী হয়ে চিত্রকর বিষয়বস্তু ও নৈসর্গিক দৃশ্য রূপায়ণে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আর সৌন্দর্য সৃজনে কখনো কখনো উপকরণগুলো আকৃতিতে বৃহৎ হলেও সুগন্ধিযুক্ত পারসিক বাগানের এরূপ দৃশ্যাবলী ইতঃপূর্বে অঙ্কিত হয়নি।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত নিযামীর খামসা পাণ্ডুলিপি অনুসরণে চিত্রিত 'লায়লার স্বামীর মৃত্যুতে বিলাপ' চিত্রটি শোকাবহ দৃশ্য অবতারণায় অসাধরণ ও অতুলনীয় (চিত্র-১৫)। আলোচ্য চিত্রে বিহযাদীয় চিত্ররীতির পরিচয় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। লায়লার স্বামীর মৃত্যুতে প্রাসাদ অভ্যন্তরে আগত শোকাভিভূত নর-নারীর বিহ্বল দেহভঙ্গিমা অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং চিত্রকলার ইতিহাসে অদ্বিতীয়। প্রাসাদ অঙ্গনে উপস্থিত চরিত্রের মধ্যে কেউ ভাবমগ্ন অবস্থায়, দু-একজন আবেগ-আপ্লুত এবং অন্যান্যরা একেঅপরের সাথে জড়িয়ে বিলাপ করছে। আর প্রাসাদের বিভিন্ন তলায় মহিলাদের সংবেদনশীল ও বিষাদগ্রস্ত উপস্থাপন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চিত্রের সমগ্র দৃশ্যপট শোকাবহ দৃশ্যের এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ইমারতের কৌণিক বিক্ষেপণ রীতি, জানালার চিত্রায়ণ ও রেলিং-এর উপস্থাপন এবং বৃক্ষসমেত নীল আকাশের পশ্চাদপট বিহযাদীয় চিত্ররীতির কথাই স্মরণ করে দেয়। কর্মচাঞ্চল্যময় অধিক চরিত্র চিত্রায়ণ বিহযাদের চিত্রকলার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং চিত্রে স্বল্পমাত্রায় লিপির আলংকারিক উপস্থাপন তার চিত্রকে চিহ্নিত করার একটি বিশেষ উপকরণ।

পারস্যের বিখ্যাত কবি শেখ নিযামীর সুপরিচিত *খসরু ওয়া শিরীন* পাণ্ডুলিপি তৈমুরীয় চিত্রকলার একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ এবং বর্তমান ওয়াশিংটন ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্টে সংরক্ষিত। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির 'স্নানরত শিরীনকে খসরুর দর্শন' ছবিটি তৈমুরীয় যুগের উৎকৃষ্ট চিত্র নিদর্শন (চিত্র-১৬)। চিত্রে দুটি সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে স্নানরত শিরীনকে আকস্মিকভাবে দেখতে পেয়ে মাথা হেলানো ভঙ্গিতে মুখে হাত রেখে খসরুর বিস্ময় অনুভূতি প্রকাশে শিল্পী অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অপরদিকে প্রস্রবণে নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় নগ্ন আবক্ষ উন্মোচন করে শিরীনকে স্নান করতে দেখা যাচ্ছে। আলোচ্য চিত্রে শিরীনের মুখাবয়ব স্বাভাবিকতার চেয়ে ব্যক্তি স্বকীয়তার এক অপূর্ব প্রকাশ এবং কবিতায় তিনি অ্যারর্মেনীয় রাজকন্যা হলেও তন্বীদেহ ও মুখমণ্ডল চিত্রায়ণে মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ বিশেষভাবে দৃশ্যমান।[৪৪] তার লম্বা চুলের বেণী উভয় স্কন্ধ বেয়ে দু-পার্শ্বে নিম্নগামী। প্রসঙ্গত বাম হাত দিয়ে শিরীন চুলের পরিপাটির কাজে ব্যাপৃত হলেও ডান হাত তার কোলে উপবিষ্ট। তবে তার ঘোড়া শাবদিয়ারের চিত্রটি পশ্চাৎ ধাবমান ভঙ্গিতে চিত্রিত এবং মাথা নিচু করে ও বাম পা উত্তোলনপূর্বক মৃদু হ্রেষাধ্বনির মাধ্যমে অপরিচিত ব্যক্তির (খসরু) উপস্থিতি সম্পর্কে রাজকন্যাকে সর্তককরণের ব্যর্থ চেষ্টায় নিয়োজিত। আর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবতারণায় সাইপ্রাস বৃক্ষ, মাসরুম আকৃতির পাহাড়, ঘাসসমেত ভূমির দৃশ্যায়ন ও সর্পিল জলাশয়ের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রঙ বৈচিত্র্যে আকাশে সোনালী রঙের প্রলেপ, পাহাড়-পর্বতে নীল, গাছপালায় সবুজ ও জলাধার চিত্রায়ণে রূপালী রঙের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।[৪৫] রিচমন্ড কায়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত নিযামী খামসার 'শিরীনের আত্মহত্যা' চিত্রটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং সংবেদনশীল আবেগপ্রবণ মুহূর্তের এক অনন্য দৃষ্টান্ত (চিত্র-১৭)। চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিহত শিরীনের মরদেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং চিত্রে বিহযাদের রংচিত্রের মনস্তাত্ত্বিকভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে। শিরীনকে দেখার জন্য উপস্থিতি চরিত্রের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গি ও আক্ষেপ যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং অত্যন্ত ভাবাবেগপূর্ণ। ভাবাত্মক ও অনুভূতিপ্রবণ এ ধরনের শোকাবহ চিত্রায়ণ বিহযাদের রঙ-তুলীর স্পর্শে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে, যা সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতীপূর্ণ। তাছাড়া চরিত্রের চাতুর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি, প্রাণ চাঞ্চল্যময় অধিক চরিত্র চিত্রায়ণ এবং সামগ্রিক সুসামঞ্জস্যতা বিহযাদের চিত্ররীতির কথাই ঘোষণা করছে। উল্লেখ্য যে, একক কিংবা দলবদ্ধ মহিলাদের প্রতিকৃতি চিত্রায়ণ সাফাভী চিত্রকলার এক জনপ্রিয় বিষয়বস্তু। এ

যুগে উচ্চপদস্থ মহিলাদের আড়ম্বরপূর্ণ রীতিতে চিত্রিত করা হয়েছে এবং সর্বদা তাদের গৃহকর্মী ও পরিচারিকা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখা যায়। তাছাড়া সাফাভী মহিলাদের চিত্রায়ণে ডিম্বাকৃতির মুখাবয়ব, লম্বিত গ্রীবা, তন্বীদেহ ও ভাবপ্রবণ চেহারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা বৈচিত্র্যময় নকশাকৃত পোষাক ও মাথায় স্কার্ফ পরিহিত। কিন্তু সাধারণ গৃহকর্মী ও পরিচারিকাদের পাশাপাশি দরিদ্র শ্রেণির মহিলারা অনুরূপ পোষাক পরিধান করলেও সেগুলো ছিল অতি সাধারণ ও নিম্নমানের।

উসমানীয় চিত্রকলায় নারী চরিত্র

উসমানীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ মধ্যএশিয়ার ওঘুজ শাখার সেলযুক গোত্রীয় তুর্কী। তারা গোবি মরুভূমি এবং ওরাল পর্বতমালার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যাযাবর জীবনযাপন করলেও তাদের আদি নিবাস ছিল মধ্যএশিয়ার উইগুর অঞ্চলে। নবম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে কিরগিযরা তাদের স্বীয় আবাস ভূমি থেকে বিতাড়িত করলে তারা তুর্কীস্তান অঞ্চলে প্রবেশ করত পরবর্তীতে পারস্য ও ইরাক দখল করে। অতঃপর ১০৫৫ সনে তুঘ্রীল বেগ সসৈন্যে বাগদাদের বুয়াহিদ আমীর মালিক রহিমকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে বাগদাদ অধিকারের মধ্যদিয়ে তারা অত্র অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এমনকি আব্বাসীয় খলিফার নিকট থেকে 'সুলতান আল-মুয়াজ্জম' উপাধি গ্রহণপূর্বক বৈধ শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৪৬] ১০৭১ সনে মালাযকারদের যুদ্ধে সেলযুক সুলতান আলাপ আরসালানের হাতে বাইজান্টাইন সম্রাট রোমানেস ডিওজেনিসকে পরাজিত হলে তারা ভূমধ্যসাগর তীরস্থ আনাতোলিয়ায় বসবাস শুরু করে এবং উসমানীয় বংশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। পরবর্তীতে উসমানীয় তুর্কীগণ আনাতোলিয়া কেন্দ্রিক এশিয়া-মাইনরে শাক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপূর্বক ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিন পর্যন্ত রাজত্ব করে। কিন্তু ১৩০০ সনে সেলযুক রোমের সর্বশেষ সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের মৃত্যু হলে উসমান নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন ও খুৎবা পাঠের প্রচলন করত বুসরা কেন্দ্রিক স্বীয় নামে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক পরিসীমা আনাতোলিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ১৪৫৩ সনে মুহম্মদ ফাতিহ রোমান সম্রাট নবম কনসটান্টাইনকে পরাভূত করে বসফোরাস প্রণালীর উপকুলবর্তী প্রাচীন গ্রীক শহর ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করেন।[৪৭] ফলে একদিকে যেমন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে, অন্যদিকে ইউরোপ পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রসার লাভ করে। আর তখন থেকে ১৯২৪ সন পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল তুর্কী নাম ইস্তাম্বুল উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী শহর হিসেবে টিকে ছিল।

উসমানীয় তুর্কীগণ হেলেনিস্টিক, বৌদ্ধ ও ম্যানিকীয় ধর্মের প্রভাবে সর্বপ্রাণবাদ ও মায়াবাদ ধর্মের বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় তাদের চিত্রকলায় উভয় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে।[৪৮] সুদীর্ঘ উসমানীয় শাসনামলে দুটি ধারায় — *নাক্কাশ-ই-রোম (Nakkash-i-Rum)* ও *নাক্কাশ-ই-ইরানী (Nakkash-i-Irani)* — পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয়েছে। প্রথমোক্ত ঘরানায় দালিলিক গ্রন্থসমূহ যেমন- ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংবলিত *শাহেনশাহনামে*, রাজকীয় উৎসব সম্পর্কিত *সুরনামে* ও *হুনেরনামে*, বিভিন্ন অভিযান সংক্রান্ত *সেফের-ই-সিজেতভার* এমনকি রাজকীয় প্রতিকৃতির পাশাপাশি সাধারণ্যের প্রতিকৃতি প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে শেষোক্ত চিত্রশালায় পারসিক বিষয়বস্তু নির্ভর *শাহনামা*, *খামসা-ই-নিযামী*, *ইস্কান্দারনামা*, *দীওয়ান* প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি চিত্রণের উদাহরণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত ধারায় চিত্রিত পাণ্ডুলিপিসমূহ পারসিক বিষয়বস্তু নির্ভর হলেও মূলত এগুলো উসমানীয়করণকৃত। উসমানীয় চিত্রকলার বিষয়বস্তু অধিক বিস্তৃত, যেমন- রাজন প্রতিকৃতি চিত্র, দরবারে রাজকাহিনী, জলে-স্থলে সামরিক অভিযান, ইউরো-এশিয়ার বিভিন্ন শহরের দৃশ্য (ইস্তাম্বুল, তাব্রীজ, বাগদাদ, আলেপ্পো, দিয়ারবেকির), মধ্যবৃত্ত ও সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্যর দৃশ্যাবলী, মহিলাদের

দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের চিত্র [স্নানরত মহিলা, হেরেমে কর্মরত মহিলা, পতিতালয়ে আক্রান্ত মহিলা, নৃত্যরতা মহিলা], বনভোজনের দৃশ্য, শিকারের দৃশ্য, পলোখেলার দৃশ্য, অভ্যর্থনার দৃশ্য, পশুপাখির চিত্র, বৃক্ষ ও পুষ্পের চিত্র, ধর্মীয় চিত্র প্রভৃতি। আর এসব বিষয়াবলম্বনে অসংখ্য চিত্রাঙ্কিত হয়েছে, হয়তোবা সে কারণেই পণ্ডিতগণ এ ঘরানাকে অধিক গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছেন। প্রায় সাড়ে তিনশত বছর ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে এ যুগে চিত্রিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ও *মোরাক্কা*[৪৯] চিত্রে এসব বিষয়বস্তুর রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উসমানীয় চিত্রকলায় যেমন পারসিক বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তেমনি অঙ্কনেও পারসিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে বৃহৎ পাগড়ী, আজানুলম্বিত ঢিলাঢালা পোষাক, গম্বুজের ন্যায় *কুলার* সংযোজন, প্রধান চরিত্র সর্বদা বৃহদাকারে চিত্রায়ণ, প্রায়শ বাস্তবধর্মী ঘটনার উপস্থাপন, পোষাকে লাল রঙের প্রাধান্য, রাজন্য প্রতিকৃতি চিত্র প্রভৃতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত উসমানীয় চিত্রকলা বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন। এ সময়ের প্রখ্যাত চিত্রকর হলেন সিনান বেক, যিনি ইউরোপীয় রীতিতে চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট পারদর্শি ছিলেন। আর ইউরোপীয় প্রভাবের কারণেই মূলত পারসিক ও মোগল চিত্রকলার ন্যায় উসমানীয় চিত্রকলার পতনের পথ তরান্বিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে অঙ্কিত 'মদ্যপায়ী মাতাল যুবক' ও 'নৃত্যরতা যুবতী' — প্রতিকৃতি দুটির পোষাকের আধুনিক রূপায়ণ প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপীয় কায়দায় রচিত, যেগুলোকে উসমানীয় চিত্রকলার যবানিকাপাতের উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়।

অটোমান আমলে অষ্টাদশ শতকে *হামসী-ই-আতাই* পাণ্ডুলিপির ঘটনা দৃশ্যপটে চিত্রিত 'পুরুষত্বহীন স্বামীর বিরুদ্ধে একজন নারীর অভিযোগ' চিত্রে সমাজের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে (চিত্র-১৮)। টুপি ও গাউন পরিহিত উসমানীয় কাজী মঞ্চে সমাসীন এবং যৌনকর্মে ব্যবহৃত পুরুষাঙ্গের ন্যায় বিশেষ কোনো বস্তু তিনি ধরে আছেন [zibik or dildo], যেটি অভিযোগের স্বপক্ষে নারীর একমাত্র প্রমাণ। তার সম্মুখে তিনজন পুরুষ চরিত্র এবং দু-জন নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হালকা ছায়া রঙের বোরকা পরিহিত এ চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র (মহিলা) কালো স্কার্ফে ঢাকা মাথায় সাদা রঙের উড়নিতে আচ্ছাদিত। অভিযোগী মহিলার দু-হাত সঞ্চালনের ভঙ্গি ও দৈহিক অভিব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনারভাব ফুটে উঠেছে এবং সমসাময়িক বৈশ্বিক শিল্পকলার ইতিহাসে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ। তাছাড়া তার পিছনে দণ্ডায়মান লাল রঙের বোরকা ও একই ধারায় মাথা আবৃত অপর নারীর – হতে পারে তার (অভিযোগকারী) মেয়ে কিংবা পরিচারিকা – সুবোধ চেহারা যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন। আর আজানুলম্বিত ঢিলাঢালা পোষাক ও অটোমান পাগড়ী পরিহিত এবং মাথায় লাল কূলা সংযোজিত গোবেচারা স্বামীর মুখাবয়বের মধ্যে অসহায়ত্বের ছাপ প্রস্ফুটিত। অপর দু-জন পুরুষ চরিত্র – সম্ভবত কাজীর সহকারী কিংবা আগন্তুক কোনো ব্যক্তি – অবাক বিস্ময়ে ঘটনাটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। চিত্রটি মধ্যযুগীয় তথা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ অংশ এবং মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনালেখ্যের এক অনন্য উদাহরণ।

উসমানীয় শাসনামলে চিত্রিত *যেনাননামে* পাণ্ডুলিপিতে মহিলাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড যেমন- স্নানরত মহিলা, হেরেমে কর্মরত মহিলা, পিকনিকে মহিলা, পতিতালয়ে আক্রান্ত মহিলা প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির একটি চিত্রের সকল চরিত্র সাদা বর্ণে অঙ্কিত, যাদের অধিকাংশ নগ্ন ও অর্ধ-নগ্ন স্বাচ্ছন্দ-কামদপূর্ণ ভঙ্গিমায় স্নানকর্মে ব্যস্ত এবং তাদের সুডৌল দৈহিক কাঠামো যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী। ঠিক একইভাবে *যেনাননামে* পাণ্ডুলিপির অপর একটি চিত্রে 'পতিতালয়ে আক্রান্ত মহিলা' দৃশ্যটি যথেষ্ট হৃদয়বিদারক ও বেদনার্ত। চিত্রে চারজন পুরুষ ও একজন মহিলার ছবি অঙ্কিত হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন বর্ণের যেমন- লাল, কালো, হালকা সবুজ প্রভৃতি রঙের পোষাকে সজ্জিত। খানিকটা দরজা ভিড়ানো একটি কক্ষের অভ্যন্তরে চিত্রটি রচিত। পুরুষদের মধ্যে একজন পতিতালয়ের জনৈক মহিলার সাথে যৌন সঙ্গম কাজে ব্যাপৃত। চিত্রে যৌন সঙ্গমকারী পুরুষের ছবি বেশ আনন্দদায়ক মনে হলেও মহিলার মুখাবয়বে অন্তর্দহনের

ছাপ অনেকটাই ফুটে উঠেছে এবং দেখে মনে হবে যেন তিনি নির্যাতনের শিকার। অপর তিনজন পুরুষ যৌনসঙ্গমের পূর্ব প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। মধ্যযুগীয় নারী নির্যাতনের এ ধরনের ঘটনা হয়তোবা অধুনা সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং যৌন হয়রানী বর্তমান সমাজের একটি ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, *যেনাননামে* পাণ্ডুলিপিতে তৎকালীন নারীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ভঙ্গিতে কিংবা নৈতিকতার নিরিখে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। নারীদের এরূপ বিবরণ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সমসাময়িক মোগল ও সাফাভী কাব্যচিত্রে দৃশ্যমান। বিশেষ করে ষোড়শ শতকে চিত্রিত 'রাজধানীর নিভৃত উদ্যানে সমবেত ভোজের দৃশ্য' (mixing and mingling in the private gardens of the capital) চিত্রটি শহর থেকে অনতিদুরে ও প্রকৃতির সানিধ্যে জনাকীর্ণ ভোজের দৃশ্যায়ন যথেষ্ট মনোরম। আলোচ্য চিত্রে খাদ্য, পানীয় এমনকি সঙ্গীত উপভোগে ব্যস্ত কতিপয় প্রেম-আচ্ছন্ন যুগল চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবার পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো চিত্রে হাম্মামে কর্মরত মহিলাদের পাশাপাশি প্রতিবেশী পুরুষ চরিত্র উপস্থাপিত হলেও পতিতালয়ের বাইরে সাধারণ্যের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুর্ভাগ্যবশত *যেনাননামে* পাণ্ডুলিপির হাম্মাম বা স্নানাগারের দৃশ্য খুব একটা পাওয়া না গেলেও ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপি থেকে এ ধরনের কিছু চিত্র গবেষণাধর্মী কোনো লেখায় কিংবা অটোমান সামাজিক ইতিহাসের উপর নির্মিত ভিজুয়াল ডকুমেন্টরীতে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় চিত্রকলায় নারী চরিত্র

উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালীদের শাসনামলে (৭০৫-১৫) খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয় দশকে (৭১২) মুহম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম পদচারণা। কিন্তু সে সময় ভারতে স্থায়ী মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে গজনভী সুলতান যথাক্রমে সুবক্তিগীন (৯৭৭–৯৯৭) ও সুলতান মাহমুদ গজনী (৯৯৫–১০৩০) কর্তৃক বহুবার ভারতবর্ষে বিজয়াভিযান পরিচালিত হয়। অথচ তাদের এসব অভিযান রাজনৈতিক দিকে থেকে যেমন নিস্প্রভ ছিল, তেমনি মুসলিম বিশ্বের নিকট ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার প্রকাশ পেয়েছিল। অতঃপর ১১৭৩ সনে সুলতান শিহাব আদ-দীন মুহম্মদ ঘুরী গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে ভারতের মুলতান, উচ ও লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত ভারতে স্থায়ী ও শক্তিশালী কোনো প্রশাসনিক কাঠামো রচিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তারই শাসনামলে কুতুবউদ্দীন আইবকের নেতৃত্বে ১১৯২ সনে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে চৌহান নৃপতি পৃথীরাজের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১২০৬ সন পর্যন্ত গজনভী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে। কিন্তু উক্ত সনে সুলতান ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দীন আইবক স্বাধীনতা ঘোষণাপূর্বক দিল্লি কেন্দ্রিক ভারতে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১২৯০ সন পর্যন্ত মামলুক বংশ নামে স্থায়ী ছিল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মামলুক পরবর্তী সময়ে খলজী আমীর (১২৯০-১৩২০), তুগলক বংশ (১৩২০-১৪১৪), সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৪৪) ও লোদী বংশের (১৪৫১-১৫২৬) সুলতানগণ ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এতদিন ভারতের সিংহাসনে সমাসীন সুলতানগণ ছিলেন মধ্যএশিয়ায় বসবাসকারী তুর্কী বংশোদ্ভূত, যদিও সৈয়দরা নিজেদের মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র হাসান-হোসেনের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন।

সুদীর্ঘ সুলতানি শাসনামলে ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাস যথেষ্ট ঘটনাবহুল হলেও শিল্পকলার ইতিহাস বিশেষ করে চিত্রকলার ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। মূলত স্থানীয় বাধা-বিপত্তি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (নিজেদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব), বিষয়বস্তুর অপ্রতুলতা, ভাষাজ্ঞানের অভাব, ১৩৯৮ সনে তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ ও দিল্লির ধ্বংস সাধন প্রভৃতি কারণে এ শিল্পের ক্রমোন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। প্রসঙ্গত ভারতীয় চিত্রকলার বিষয়বস্তু ভারতীয় সনাতন

ধর্ম বিষয়ক এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য উপাসনাযোগ্য প্রতীমা কেন্দ্রিক, যেটি মুসলিম শাসকবর্গ অথবা স্বদেশি পৃষ্ঠপোষকগণ সহজেই গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ভারতীয় পাণ্ডুলিপি নাগরী বা মৈথিলী কিংবা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় সেগুলো অনুবাদ করা যেমন কঠিন ছিল, তেমনি মুসলিম শিল্পীগণ ইসলামীকরণের প্রয়াসে আরবী বা ফার্‌সি লিপিকে চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যে ইসলামীরূপ দিয়েছে প্রারম্ভিক ভারতবর্ষে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। সর্বোপরি ইসলামের নামে সুলতানগণ নিজেদের সুসংহত করতে চেয়েছিলেন এবং সে প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্মের বিপরীতে ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে নিজেদের খাপ খেয়ে নেবার তাগিদে পৌত্তিলকতার আভাসে এমন একটি শিল্পকর্ম চর্চায় তারা নিজেদের আকৃষ্ট করতে চাননি।[৫০] তবে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়াবলীর প্রেক্ষাপটে এ যুগে কতিপয় পাণ্ডুলিপি যেমন- *চন্দায়ণ* (গৌর চন্দ্রের প্রেম-উপাখ্যান সংবলিত), *কল্পসূত্র* ও *কালকাচার্যকথা* (জৈন সাধু কালকাচার্যের জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত), *কালচক্রতন্ত্র* (বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ), *ভগবত পুরাণ* (শ্রী কৃষ্ণের জন্ম ও বৃন্দাবনে তার লীলা-কাহিনী), *চৌরপঞ্চাশিকা* (চোরের পঞ্চাশ চরণ), *গীতগোবিন্দ* (বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণেরে প্রেম লীলা সম্পর্কিত), *আরণ্যক পার্বণ* (অরণ্য গ্রন্থ) প্রভৃতি চিত্রিত হয়। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ চিত্রায়ণের মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, তৎকালীন দিল্লির কোনো কোনো সুলতান এবং স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কেউ কেউ এ শিল্প চর্চায় বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এ সময়ের চিত্রকলায় দৈশিক চিত্ররীতির প্রভাব যথা- চরিত্রের পার্শ্ব দর্শানো ভঙ্গি (profile view), নয়ন বিস্ফারিত ও কর্ণ দীর্ঘায়িত, কটিদেশ সরু হলেও বক্ষ ও নিতম্ব প্রসারিত, জাঁকালো গহনার ব্যবহার, ভারতীয় পরিচ্ছদ ও মাথা অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিতকরণ, বস্ত্রের কৌণাকৃতির প্রান্তদেশ, ভারতীয় পরিবেশ ও স্থাপত্যিক ইমারত প্রভৃতি যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি প্রারম্ভিক ইসলামী চিত্রকলার (মেসোপটেমীয় চিত্রকলা) নিশ্চল স্থিরতার ছাপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৫২৬ সনে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের মধ্যদিয়ে ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শিল্পকলার ইতিহাসে পারসিক প্রভাবান্বিত এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কেননা মধ্যএশিয়ার ফরগণা নিবাসী আমীর তৈমুরের উত্তরসুরী হিসেবে সম্রাট বাবর পূর্ব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় নিজেকে একজন সংস্কৃতিবান শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় মোঙ্গল ও তুর্কী সংস্কৃতির বিকশিত ধারা নতুন আঙ্গিকে ভারতবর্ষে প্রবাহিত হয়। ১৫২৮-২৯ সনে তুর্কী ভাষায় লিখিত বর্তমান রামপুর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত *দীওয়ান* পাণ্ডুলিপি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।[৫১] পরবর্তী সম্রাট হুমায়ূন ১৫৪০ সনে আফগান শাসক শেরশাহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে নির্বাসিত জীবনে পারস্যের শাহ তাহমাসপের সান্নিধ্যে এসে চিত্রকলা চর্চায় অনুপ্রাণীত হন। তার শাসনামলে মীর মুসাব্বীর ও তাব্রিয থেকে আগত তদীয় পুত্র মীর সাঈদ আলী এবং শীরায থেকে আগত খাজা আব্দুস সামাদ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দিল্লির দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তারাই প্রকৃতপক্ষে মোগল ঘরানার রূপকার। বস্তুত ভারতীয় মোগল চিত্রকলার উন্নয়নে ও ক্রমবিকাশে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয় এবং অবদান অবিস্মরণীয়। প্রসঙ্গত স্বল্পকালীন রাজত্বকালে সম্রাট হুমায়ূন পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণে তেমন কোনো উদাহরণ সৃষ্টি করতে না পারলেও তার অবদান প্রকৃতঅর্থে স্বপ্ন দর্শনে ও ভিত রচনায়, যে ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে মোগল চিত্রকলা পরবর্তীতে সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং বৈশ্বিক শিল্পকলার ইতিহাসে তার নিজস্ব আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বলাবহুল্য মোগল চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার ছিলেন সম্রাট আকবর এবং তিনি ছিলেন পিতার মনোবাসনা ও রচিত ভিত্তিভূমির সার্থক রূপদানকারী। তার সময় মোগল চিত্রকলা দুটি স্বতন্ত্র ধারায় – পাণ্ডুলিপি ও *মোরাক্কা* – চর্চিত হয়েছে।[৫২] তার নতুন রাজধানী শহর ফতেপুর-সিক্রির (১৫৬৮-১৫৮৫) ইমারতরাজি বিশেষ প্রক্রিয়ায় চুনের প্রলেপ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নকশায় যেমন- সেলিমের জন্ম সংবাদ, হস্তীর লাড়াই, বিমূর্ত আরব্য ও পুষ্প নকশায় সুশোভিত ছিল। তার সময়ে চিত্রিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে *হামযানামা*, *গুলিস্তান-ই-সাদী*, *খামসা-ই-আমীর খসরু দেলভী*, *বারবনামা*, *আকবরনামা*,

তুতীনামা, *যোগবশিষ্ট*, *নাফাত আল-উনস* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব পাণ্ডুলিপির ঘটনাবলম্বনে অঙ্কিত চিত্রসমূহে রঙের প্রাচুর্যতা পরিলক্ষিত হলেও সমসাময়িক পারসিক চিত্রের ন্যায় এগুলো ছিল নিশ্চল ও শান্তস্নিগ্ধ প্রকৃতির।

১৫৯৮ সন সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিত্রকর্মের সূচনা পর্ব হিসেবে বিবেচিত এবং তার সময় মোগল চিত্রকলা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। প্রসঙ্গত চিত্রকলার ইতিহাসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বা মোগল রেনেসাঁ কালপর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশেষ করে ইউরোপীয় প্রভাবপুষ্ট মোগল চিত্রকলা শিল্প জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময়ে চিত্রিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে *রাজ কুনওয়ার*, *আনোয়ার-ই-সুহাইলী*, *খামসা-ই-মীর আলী শীর নওয়ায়ী* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব পাণ্ডুলিপির চিত্রকর্মের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল শিকারের দৃশ্য, বিনোদনমূলক, পলোখেলা বা হাতীর লাড়াই-এর দৃশ্য, দরবেশতন্ত্র বা সাধু-সন্ন্যাসীদের কর্মকাণ্ড, প্রতিকৃতি চিত্র প্রভৃতি। তার সময় প্রতিকৃতি চিত্রায়ণ মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাসে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়। উল্লেখ্য যে, *মোরাক্কা* চিত্রায়ণ সম্রাট আকবরের শাসনামলে সূচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে *মোরাক্কা* বাঁধাইশিল্প একটি বিশেষ রীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বলাবাহুল্য জাহাঙ্গীরের আমলে অঙ্কিত চিত্রে রঙের ব্যবহারে কিছুটা হালকা ও শীতলভাব পরিলক্ষিত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকার সম্রাট শাহজাহান স্থাপত্যশিল্পের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সমধিক পরিচিত লাভ করলেও তার সময় মোগল চিত্রকলার পতনের পথ তরান্বিত হয়। এ সময়ে চিত্রিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে *পাদশাহনামা*, সাদীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান*, *সূয ওয়া গুদায* প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আর সম্রাট আওরঙ্গজেব চিত্রকলা ও প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করায় স্বীয় গৌরব হারিয়ে মোগল চিত্রশিল্পের ক্রমাবনতির সূচনা হয় – অবশেষে পর্যবেসন ঘটে।

নাগরী ভাষায় আনুমানিক ১৫০০ সনে রচিত মুম্বাই-এর মাধুরী দেশাই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হিন্দু ধর্মগ্রন্থ *ভগবত পুরাণ*-এর বাতাবরণে চিত্রিত 'বালক শ্রী কৃষ্ণের স্নান' চিত্রটি আনুমানিক ১৫০০ সনে চিত্রিত (চিত্র-১৯)। শ্রী কৃষ্ণের স্নানকর্মে নিয়োজিত তিনজন মহিলার মধ্যে একজন মা এবং অন্য দু-জন পরিচারিকা হতে পারে। চিত্রে সকলেই পার্শ্ব দর্শানো ভঙ্গিতে চিত্রিত। তাদের নয়ন বিস্ফারিত ও কর্ণ দীর্ঘায়িত এবং কটিদেশ সরু হলেও বক্ষ ও নিতম্ব ব্যাপক প্রসারিত। ভারী গহনা পরিহিত মহিলারা অপূর্ব সাজে সজ্জিত। তাদের পরনে শাড়ি ও মাথায় উড়নিতে আচ্ছাদিত। পরিচ্ছদ হিসেবে শাড়ি ও উড়নির ব্যবহার ভারতবর্ষের মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী বসন। উল্লেখ্য যে, শাড়ির কুঁচি সন্মুখভাগে প্রসারিত ও প্রান্তদেশ কৌণিকভাবে চিত্রিত। অনুরূপভাবে ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আনুমানিক ১৬১৫ সনে চিত্রিত হিন্দোল রাগের রাজকীয় তরুণ-তরুণীর চিত্রটি রাগমালা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত।[৫৩] দোলনায় আসীন লাল রঙের পোষাক পরিহিত তরুণের কোলে উপবিষ্ট ভারতীয় এক তরুণীর দৃশ্যায়ণ রোমান্টিক পারিপার্শ্বিকতায় রচিত। চিত্রে তরুণীর দৈহিক অবকাঠামো, স্বর্ণালঙ্কার ও পরিচ্ছদ সুস্পষ্ট ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত হলেও পারিপার্শ্বিকতা নিঃসন্দেহে পারসিক শৈলীর পরিস্ফুটন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় চরিত্রের সন্মুখে বীণা বাদনরত একজন মহিলা শিল্পীর সক্রিয় উপস্থাপনে এ রাগটি রূপায়িত। মহিলার গোলাকার মুখাবয়ব পারসিক রীতিতে অঙ্কিত হলেও স্থূল দৈহিক অবয়ব ও শাড়ি পড়নের কায়দা যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন এবং ভারতীয় পরিচ্ছদের স্পষ্টতই প্রতিফলন। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিংবা আধুনিকী কায়দায় সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় সমাজে মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে শাড়ীর পাশাপাশি সালোয়ার-কামিজ ও ম্যাক্সির বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য স্বাস্থ্যবতী তন্বী রমণীর সুডৌল দেহভঙ্গিতে লোকশিল্পের রেখা ও ফর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত। আর পশ্চাতে দৃশ্যমান অপরূপ সাজে সজ্জিত অপর মহিলা দু-হাতে দোলনা দোলানোর কাজে ব্যাপৃত। প্রসঙ্গত চিত্রাঙ্কণে মোগল ও দক্ষিণ ভারতীয় রীতির, যেমন- চোলী (কাঁচুলি), শাড়ি পড়নের কৌশল ও দেহের স্থূল রূপায়ণ, প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৫৬২-৭৭ সনে আগ্রায় চিত্রিত *হামযানামা* পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে মারিয়া সারে-হারম্যান সংগ্রহশালা অ্যাসকোনায় রক্ষিত 'মিনারের চূড়ায় সংরক্ষিত ছোট বৃত্তে মিহরদুখতের শর নিক্ষেপ' চিত্রটি মিশ্র রীতির এক অসাধারণ চিত্রায়ণ (চিত্র-২০)। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন পারসিক গ্রন্থ *রজমনামা* কিংবা ভারতীয় মহাকাব্য *রামায়ণ*-এর ন্যায় *হামযানামা* ফার্সি অনুবাদ গ্রন্থ।[৫৪] চিত্রে মিহিরদুখতের সঙ্গে দ্বিতীয় তলায় উপবিষ্ট তিনজন পরিচারিকার মধ্যে একজন চৌরী দিয়ে তাকে বাতাস করছে। আর নীচতলার বারান্দায় রাজকুমারীর জন্য অজ্ঞাত কিছু পরিবেশনকারী অপর তিনজন গৃহকর্মী স্বীয় কর্মে ব্যাপৃত। ছবিটি একদিকে যেমন সমসাময়িক পারসিক চিত্রকলার জাকজমকতা ও শান্ত-স্নিগ্ধতার পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় বৃক্ষ যেমন- কলা গাছ, কদম গাছ, ছাইচ ও বপ্র সংবলিত স্থাপত্য ইমারত, মিহরদুখত ও অন্যান্য সহচরদের গতিশীলতা, তাদের সরু কোমর ও ভারী নিতম্ব, চুলের লম্বা বেণী ও আড়ম্বরপূর্ণ স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার প্রভৃতি চিত্রটিকে ভারতীয় ঘরনার বলে সনাক্ত করে। বিশেষ করে জাঁকালো গহনা, চুলের বিন্যাস ও পোষাকপরিচ্ছদ এতদঞ্চলের মহিলাদের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী পোষাক ও বেশভূষার কথাই ঘোষণা করছে। তবে মহিলাদের পরিহিত আটশার্ট পোষাকের কৌণিক প্রান্ত ও চুজ পাজামা চিত্রায়ণে আধুনিকতার (ইউরোপীয় চিত্ররীতি) ছাপ লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত বাজি রেখে শর নিক্ষেপ ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য মহাভরতে বর্ণিত অর্জুনের শর নিক্ষেপের কথাই স্মরণ করে দেয়।[৫৫] উল্লেখ্য যে, চিত্রটি আকাশধৃত আলোকচিত্রের ভঙ্গিমায় চিত্রিত এবং এ ধরনের আন্তরিক্ষ দৃশ্যায়ণ *হামযানামা* পাণ্ডুলিপির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া বিষয়বস্তু খণ্ডিত আকারে উপস্থাপন অর্থাৎ সামগ্রিক ঘটনার অংশ বিশেষ দর্শানো এবং অবশিষ্ট অংশ অচিত্রিত রাখা আলোচ্য পাণ্ডুলিপির অপর এক বিশেষত্ব, যা পারসিক মোঙ্গল চিত্ররীতির যথার্থই অনুকরণ। পরবর্তীতে বৈশিষ্ট্যটি মোগল চিত্রকলার ঐতিহ্যবাহী রীতিতে পরিণত হয়। সর্বোপরি রঙের খেলায় মুখাবয়ব ও বক্ষে আলো-আঁধারের স্বল্প প্রতিফলন *হামযানামা* পাণ্ডুলিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও মহিলাদের জমকালো কর্ণভূষণ উত্তর ভারতীয় চিত্ররীতির সার্থক রূপায়ণ।

সম্রাট আকবরের শাসনামলে ১৫৮০-৮৫ সনের মধ্যে ফতেপুর-সিক্রিতে যেসব পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *তুতীনামা* (১৩২৯-৩০) বা একটি তোতাপাখির আত্মজীবনী। *তুতীনামা* প্রাচীন সংস্কৃত গল্প শুকসপ্ততির একটি পারসিক সংস্করণ।[৫৬] এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রবাসে স্বামীর অবস্থানের কারণে বিরহকাতর একজন গৃহবধূকে গল্পচ্ছলে সান্তনার বাণী শোনানো তোতাপাখির সংলাপ। ডাবলিন চেষ্টার বেটি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত গৃহ অভ্যন্তরে চিত্রিত কথপোকথনরত তোতাপাখি ও গৃহবধূ — এরূপ একটি দৃশ্যে তাদের উভয়ের প্রতিকৃতি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (চিত্র-২১)। খাচায় আবদ্ধ সবুজ রঙে রঞ্জিত টিয়া পাখির সাথে পার্শ্ব দর্শানো ভঙ্গিতে চিত্রিত মহিলার পোষাকপরিচ্ছদ, কালো রঙের চুলের লম্বা বেণী, গলায় ও কানে সজ্জিত ভারী গহনা প্রভৃতি ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত। তবে বধূর পরিধেয় হাফ হাতা ছিটন বিশিষ্ট পোষাকে আধুনিকতার ছাপ পরিস্ফুটিত। তাছাড়া তার হাত সঞ্চালনের ভঙ্গিমা ও মুখভঙ্গি একজন বিরহকাতর গৃহবধূর সার্থক রূপায়ণ ও যথেষ্ট হৃদয়বিদারক। বলাবাহুল্য প্রবাসে স্বামীর অবস্থানের কারণে বর্তমান সমাজেও বহু গৃহবধূ এরূপ বিরহকাতর জীবনযাপন করছে। সুতরাং চিত্রটি ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজচিত্রের এক জীবন্ত উদাহরণ। ছাইচ ও মার্লন বপ্র সংবলিত প্রাসাদের চিত্রায়ণ ভারতীয় বলেই চিহ্নিত করা যায়। তবে জালাইর আমলের পূর্ণ ইমারতের চিত্র এখানে অনুপস্থিত। কেবল ইমারতের অংশ বিশেষ চিত্রায়ণের মাধ্যমে প্রাসাদ বা প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য বোঝানোর প্রচেষ্টা জালাইর পূর্ববর্তী ইসলামী চিত্রকলার এক বিশেষ ঐতিহ্য। আর পটভূমি হিসেবে কিছু বৃক্ষ ও আকাশ চিত্রায়ণের মধ্যদিয়ে পারসিক রীতির ছাপ প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আলোচ্য চিত্রে ভাঁজযুক্ত পর্দা চিত্রায়ণে ইউরোপীয় রীতির ছাপ অধিক পরিলক্ষিত হলেও রঙের বিন্যাসে পারস্যের চেয়ে ভারতীয় রীতির প্রাধান্য বিশেষভাবে দৃশ্যমান।[৫৭]

লাহোরে আকবরের আমলে যে কয়টি পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয়েছিল তার মধ্যে পারসিক কাব্যগ্রন্থ *বাহারিস্তান* বা বসন্তের বাগান সাদীর গুলিস্তানের অনুকরণে রচিত। অক্সফোর্ডের বডলিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি ১৫৯৫ সনে লিপিকার মোহাম্মদ হোসাইন কাশ্মীরী যরীনকলম[৫৮] কর্তৃক লিখিত হয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে।[৫৯] আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ঘটনাবলম্বনে মিসকিন কর্তৃক ১৫৯৫ সনে লাহোর কিংবা আগ্রায় অঙ্কিত বর্তমান অক্সফোর্ড বডলিন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত 'অবিশ্বস্ত স্ত্রীর সাথে স্বামীর বিরূপ কাণ্ড' ছবিটি মোগল ঘরানার একটি উৎকৃষ্টতম সামাজিক চিত্রায়ণ (চিত্র-২২)। চিত্রটি চন্দ্রালোকিত রাতের দৃশ্যায়ণ এবং মহিলাদের নিয়ে তিনটি বিচ্ছন্ন ঘটনা চিত্রিত। ছবির পটভূমি রাতের ঝলমলে চাঁদের আবছা-আলোতে অঙ্কিত, যা হলুদ রঙের আভায় উদ্ভাসিত। চিত্রের উপরিভাগে একটি গাছের নীচে একদল প্রেমিক যুগল একেঅপরের সাথে ভাবাবেগ বিনিময় করছে। আর নিম্নে সালাওয়ার-কামিজ পরিহিতা একজন মহিলা গাভীর দুগ্ধ দোহনেরত, যাকে ইনজু আমলে চিত্রিত 'কৃষকের গৃহে বাহরাম গোর' চিত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আর গম্বুজাবৃত প্যাভিলিয়নের সম্মুখে চিত্রিত আলোচ্য ছবির মূল ঘটনা স্বামীর ক্রোধান্বিত আচরণ ও স্ত্রীর আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। তাকে উদ্ধারের জন্য মা ও বোনের বিচলিত ভঙ্গিমা, বাম হাত প্রসারিত করে ও ডান হাত মুখে দিয়ে ঘটনাটি অবাক দৃষ্টিতে হাঁটুগেড়ে বসার ভঙ্গিতে অপেক্ষামান অপর একজন নারীর অবলোকন, দৃশ্যটি দেখে দরজায় দণ্ডায়মান অপর চরিত্রের বিস্ময় প্রকাশ, সর্বোপরি মূল ঘটনা দর্শনে বৃহৎ বৃক্ষের নীচে লাল ও নীল রঙের পোষাক পরিহিত বাম হস্ত মাথায় জনৈক ব্যক্তির ভাবমগ্ন চিত্রায়ণ প্রভৃতি দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে তোলা হয়েছে, যা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সমকালীন চিত্রকলার ইতিহাসে অতুলনীয়। প্রসঙ্গত চিত্রটি বর্তমান সমাজচিত্রের বাস্তবধর্মী রূপায়ন এবং আধুনিক সমাজে সংঘটিত এরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার সার্থক পূর্বাভাস হিসেব পরিগণিত হবার দাবী রাখে। মহিলারা সকলেই বিভিন্ন বর্ণের বোরকা পরিহিতা ও মাথা নানা রঙের উড়নিতে আচ্ছাদিত, যা ইসলামীকরণের এক অভিনব প্রচেষ্টা বলেই অনুভূত হয়। উল্লেখ্য যে, চিত্রে ঘটনার বিষয়বস্তু অপেক্ষা পাশ্চাদভূমির প্রাধান্য সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়, যা জালাইর আমলের চিত্রিত *শাহানামার* 'সীমূর্গের বক্ষে যালের এলবুর্য পর্বতে গমন' কিংবা *দীওয়ান-ই-খওয়াজু কিরমানীর* 'হুমায়ূনের প্রাসাদে হুমাঈ-এর আগমন' চিত্রের সাথে তুলনা করা যায়।

অভিসারিকা নায়িকার (নৈসর্গিক দৃশ্য) চিত্রটি ভারতীয় চিত্রকলার এক অনন্য নিদর্শন। প্রেমিকা দুর্যোগপূর্ণ রাতের আঁধারে মেঠোপথের দু-প্রান্তে সারিবদ্ধ গাছের মধ্যদিয়ে সঙ্গোপনে তার প্রেমিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে (চিত্র-২৩)। রমণীর তন্বীদেহ রোমান্টিক আমেজে দৃশ্যমান। উল্লেখ্য যে, জঙ্গলের মধ্যদিয়ে সর্পিল মেঠোপথের উভয় প্রান্তের সারিবদ্ধ গাছের সুমিতি এক চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। পার্শ্ব দর্শানো ভঙ্গিতে চিত্রিত তন্বীর লাবণ্যময়ী মুখাবয়বে নির্লিপ্ত চাহনি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত এবং সমগ্র দেহভঙ্গিতে একটা ছন্দায়িত মুদ্রার ক্রিয়ারূপ বিদ্যমান। যাহোক পথিমধ্যে তার পায়ের নুপুর মাটিতে পড়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া নুপুরের সন্ধানে নায়িকা পিছনে তাকিয়ে ভয়ংকর দুটি সাপ – যাদের একটি গাছের সাথে পেঁচিয়ে আছে এবং অপরটি তার পায়ের পাশ দিয়ে দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে – দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে। বাম হাতে ঘাঘরা ধরার ঢং এবং ডান হাত উত্তোলনের ভঙ্গিতে তার মনের মধ্যে উদিত আতংকের ছাপ ফুটে উঠেছে। তাছাড়া মাথার উপরে দ্বিশৃঙ্গ বজ্রপাতের চিত্রায়ণ ঘটনাটিকে আরো ভীতিকর করে তুলেছে। তরুণীর মুখমণ্ডল ও পরিচ্ছদে এবং নুপুরসহ সাপের গায়ে ও পটভূমি হিসেবে চিত্রিত গাছে বজ্রবাণের আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত। উল্লেখ্য যে, কাচুলি ও ঘাঘরা পরিহিতা মহিলার উন্নত মসলিন অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিতকরণ এবং ভারী গহনা ব্যবহার ভারতীয় চিত্রকলার পরিচায়ক। নৈসর্গিক এ দৃশ্যটি সমকালীন সমাজচিত্রের এক অনন্য উদাহরণ এবং বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত ঘটনার যথার্থ রূপায়ণ। অনুরূপভাবে ১৬৩০ সনে দিল্লিতে চিত্রিত *সূয ওয়া গুদায* (প্রজ্জলিত ও গলিত) পাণ্ডুলিপিটি সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত একটি কাব্যিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু একজন

বাগদত্তার বিবাহের দিনে বরের আকস্মিক মৃতবরণে জলন্ত চিতায় কনের স্বেচ্ছায় গমনের বিরহ কাহিনী সংবলিত। জলন্ত চিতায় আরোহণরত প্রেমিক-প্রেমিকাকে দূর থেকে ঘোড়ায় উপবিষ্ট দানিয়েল ও তার সভাসদবর্গের দর্শন অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। বেদনাবিধূর এ চিত্রটি ভারতীয় সনাতন ধর্মের এক বিশেষ ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করে দেয় এবং নারী সমাজের প্রতি এক ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ বলেই প্রতীয়মান হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিল্পজগতের এক অন্যতম শাখার নাম চিত্রকলা, যা জগতকে বিস্ময়ে ভরে রেখেছে। শিল্পীমনের ঈপ্সিত ও সুপ্ত অনুভূতির এক স্বকীয় প্রকাশ রঙ-তুলীর ছোয়ায় চিত্ররূপে পৃথিবীতে অতুলনীয় হয়ে বেঁচে থাকে। পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ প্রকাশ মাধ্যমটি সমগ্র বিশ্বে চর্চিত ও লালিত হয়েছে – এখনো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বলাবাহুল্য ইসলামী চিত্রকলায় নারী চরিত্র নিসর্গ উপাদানের মতোই চিত্রের অবিচ্ছেদ অংশ – একক স্বতন্ত্রতা খুব একটা লাভ করেনি। তবে প্রতিকৃতি চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশের লক্ষ্যে পুরুষ চরিত্রের ন্যায় কখনো কখনো নারী চরিত্র একক স্বাতন্ত্র্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম চিত্রকলার বিভিন্ন পর্যায়ে রমণী চরিত্র নানারূপে চিত্রিত হয়েছে বলে এসব চিত্র পর্যালোচনায় নারীদের সামাজিক অবস্থান, আঞ্চলিক পরিচিতি, তাদের সংস্কৃতি, বসন-ভূষণ প্রণালি, রূপচর্চার প্রকৃতি, কর্মজগতের পরিধি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া নারী চরিত্রের প্রশান্তির চিহ্ন এটাই প্রমাণ করে যে, তারা সমাজ ও রাজদরবারে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিলেন এবং সাফাভী ও মোগল চিত্রকলায় নারীদের পোষাকপরিচ্ছদ ও বেশভূষা তাদের সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি প্রাচুর্যের প্রতীকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। আবার অশান্তির প্রতিচ্ছবি থেকে প্রতীয়মান যে, সমাজ ও রাজ দরবারে তারা সর্বদাই ভোগের বস্তু এবং কোনো কোনো সময় খুবই নিগৃহীত ছিলেন বলে অনুমেয়। মুসলিম চিত্রকলায় উপস্থাপিত নারী চরিত্র মৌসুমের প্রতীক বিশেষ করে ঐশ্বরিক প্রতিনিধি, রোমান্টিকতার চিহ্ন, উর্বরতার নিদর্শন, বিরহ-বেদনার সংকেত, বিনোদনের আভাস, অবজ্ঞার পাত্র, নিগ্রহের বস্তু হিসেবে যুগে যুগে চিত্রিত হয়েছে — চিত্রপাঠে এ সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যায়। তাই সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, চিত্রকলা বিশ্ব ইতিহাস পুনর্গঠনের এক প্রামাণ্য দলিল এবং রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের দর্পণস্বরূপ।

চিত্র-১: বিবসনা নারীমূর্তির প্রতিকৃতি, কুসাইর আমরা

চিত্র-২: রূপকাশ্রিত নারী মূর্তি, কাসর আল-হাইর আল-গারবী

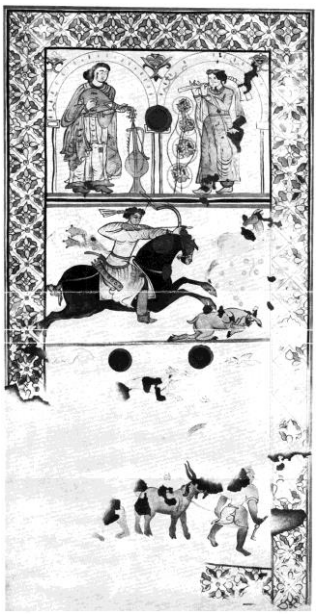

চিত্র-৩: দ্বৈত সঙ্গীত শিল্পী, কাসর আল-হাইর আল-গারবী

চিত্র-৪: দুজন নৃত্যরতা রমনী, জাউসাক আল-খাকানী প্রাসাদ

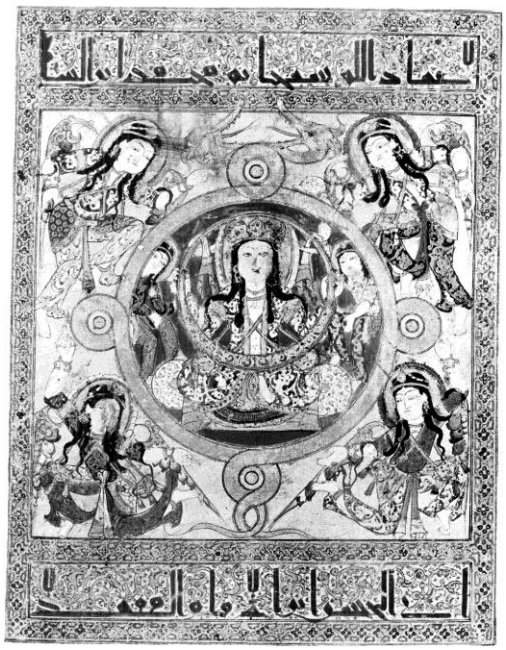

চিত্র-৫: প্রাচুর্য দেবী ও সহায়তাকারিনী অন্যান্য দেবী, মসুল ঘরানা

চিত্র-৬: একজন মহিলা কর্তৃক তাড়িত উটের পালের দৃশ্য, বাগদাদ ঘরানা

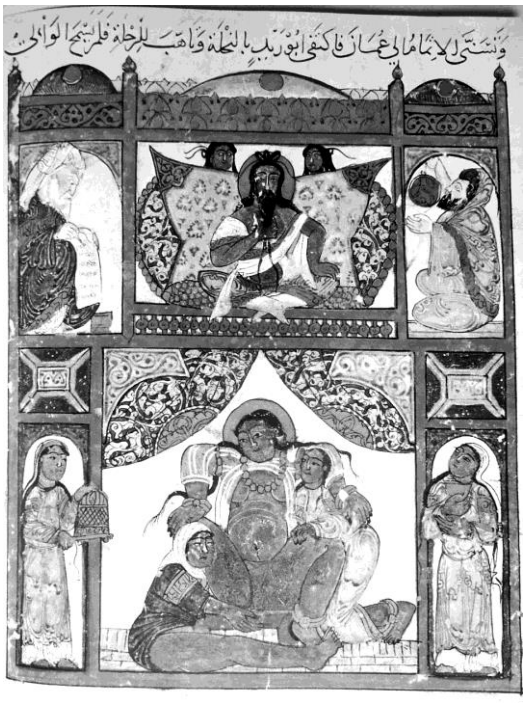

চিত্র-৭: একজন ভারতীয় নারীর প্রসবকালীন দৃশ্য, বাগদাদ ঘরানা

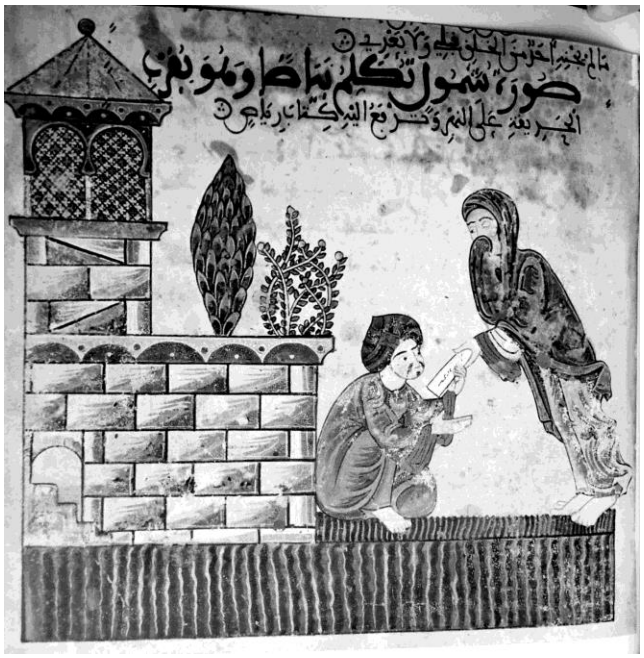

চিত্র-৮: বায়াদের নিকট রিয়াদের চিঠি হস্তান্তর, মাগরেবীয় ঘরানা

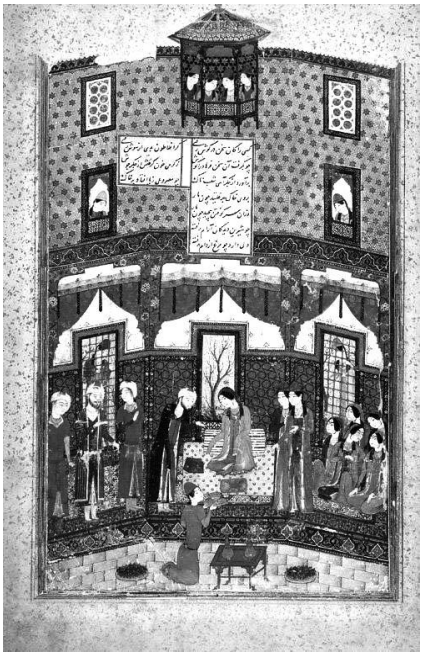

চিত্র-৯: ফরহাদকে শিরীনের সামনে আনয়ন, জালাইর চিত্রকলা

চিত্র-১০: মহিলা কর্তৃক গাভীর দুগ্ধ দোহন, ইন্‌জু চিত্রকলা

চিত্র-১১: উকি মেরে ইস্কান্দারের জলকুমারী দর্শন, শিরায ঘরানা

চিত্র-১২: শয্যাকক্ষে ধৃত চোর, জালাইর চিত্রকলা

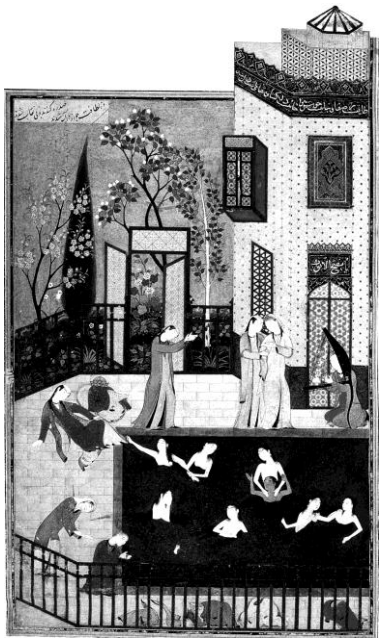

চিত্র-১৩: জলাশয়ে জলকুমারীদের অভগাহন, হেরাত ঘরানা

চিত্র-১৪: চৈনিক উদ্যানে প্রিন্সেস হুমায়ূন কর্তৃক প্রিন্স হুমাঈকে অভ্যর্থনার দৃশ্য, হেরাত ঘরানা

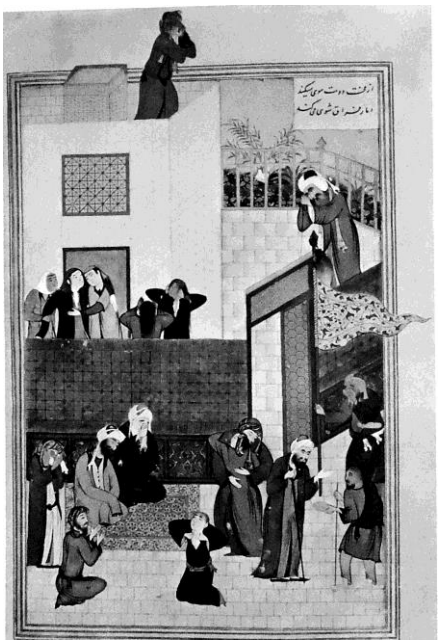

চিত্র-১৫: লায়রার স্বামীর মৃত্যুতে বিলাপ, হেরাত ঘরানা

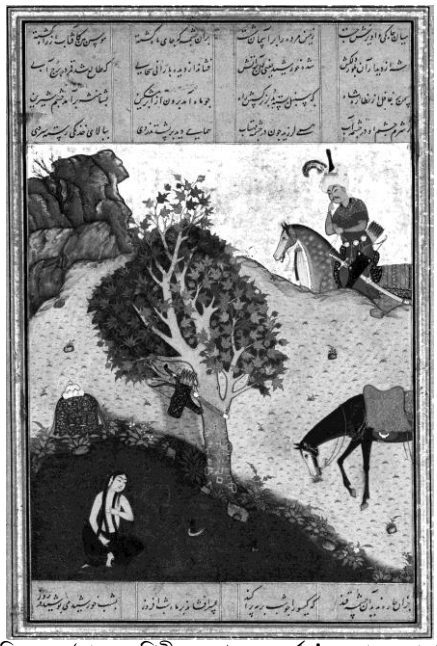

চিত্র-১৬: 'স্নানরত শিরীনকে খসরুর দর্শন', হেরাত ঘরানা

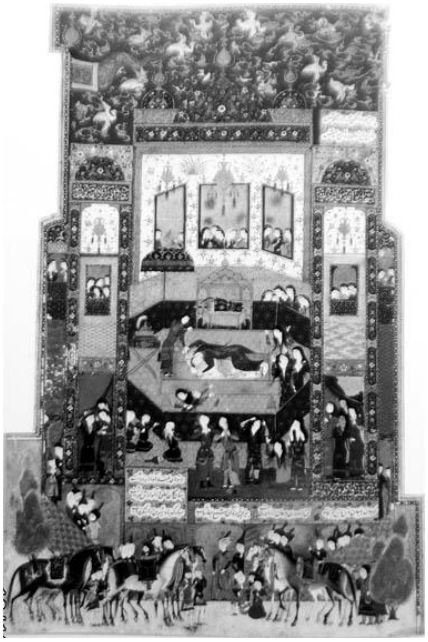

চিত্র-১৭: শিরীনের আত্মহত্যা, সাফাভী চিত্রকলা

চিত্র-১৮: পুরুষত্বহীন স্বামীর বিরুদ্ধে একজন অসহায় নারীর অভিযোগ, উসমানীয় চিত্রকলা

চিত্র-১৯: বালক শ্রী কৃষ্ণের স্নান, সুলতানি চিত্রকলা

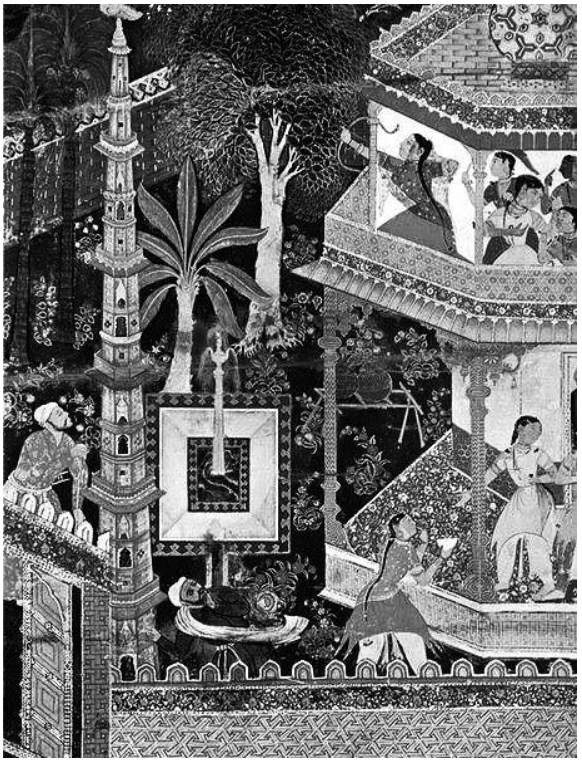

চিত্র-২০: মিনারের চূড়ায় সংরক্ষিত ছোট বৃত্তে মিহরদুখতের শর নিক্ষেপ, মোগল চিত্রকলা

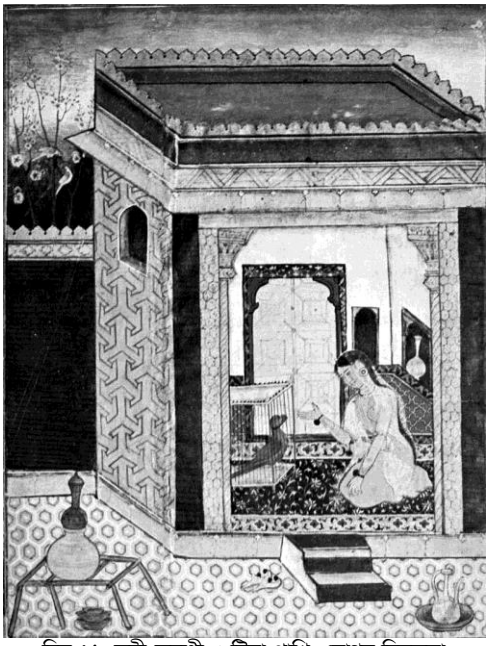

চিত্র-২১: তন্বী-তরুণী ও টিয়া পাখি, মোগল চিত্রকলা

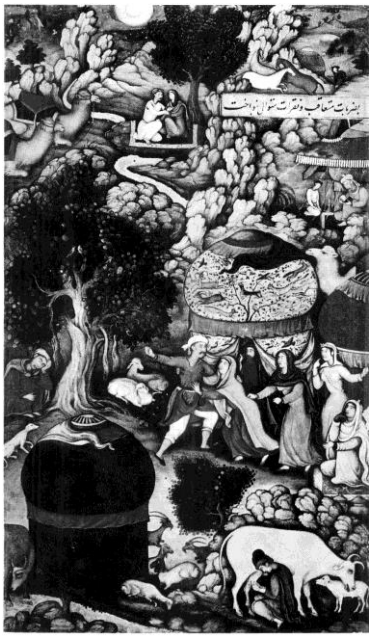

চিত্র-২২: অবিশ্বস্ত স্ত্রীর সাথে স্বামীর বিরূপ কাণ্ড, মোগল চিত্রকলা

চিত্র-২৩: অভিসারিকা নায়িকা, মোগল চিত্রকলা

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১ ইসলাম একটি ধর্মের নাম, যার মূলনীতি ইসলামী বিশ্বের সকল দেশে এক ও অভিন্ন এবং এটি একটি সর্বজনীন শব্দ, যাকে বিভাজন করা যায় না। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের অনুসারী একটি জাতির নাম মুসলিম, যারা ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং স্থানিক বা বংশীয় নামানুসারে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা চিত্রকলাকে সামগ্রিকভাবে ইসলামী চিত্রকলা এবং বিভাজিত অর্থে মুসলিম চিত্রকলা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

২ পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণ: মানুষ স্বীয় মনের সুপ্ত অনুভূতি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকে যেমন- বক্তব্যের মাধ্যমে, লিখনের মাধ্যমে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এমনকি চিত্রশিল্পের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, হস্তলিখিত গ্রন্থ বা পুস্তককে পাণ্ডুলিপি বলে। আর পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণ হলো বিচিত্র বর্ণের নকশা বা ক্ষুদ্র চিত্র সহযোগে কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যামূলক চিত্রণ।

৩ বিমূর্ত আরব্য নকশার ব্যবহার ইসলামী চিত্রকলার সনাক্তকারী বিদ্যা বা আইকনিক চিহ্ন হলেও মূলত তা সর্বদা অচিহ্নিত/শনাক্তহীন (unidentified), যাকে নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তাছাড়া এ নকশার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই, দার্শনিক মতে যা ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ বলেই ধারণা করা হয়।

৪ Richard Ettinghausen, *Arab painting* (Cleveland: The World Publishing Company, 1962), p. 11.

৫ আবুল বাসার মোশাররফ হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ২০০৪), পৃ. ২৭। (পরবর্তীতে *ইসলামী চিত্রকলা* নামে উল্লিখিত হবে)।

৬ আরবী ভাষা হিজাজ পেরিয়ে পশ্চিমে স্পেনের পিরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত এবং পূর্বে সিন্ধুর তীরবর্তী অঞ্চল ও মধ্যএশিয়ার তাসখন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে আরব নামে পরিচিত বলে জনাব মফিজুল্লাহ কবির উল্লেখ করেছেন। দেখুন- মফিজুল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ২৬১।

৭ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৪৬।

৮ *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ৩৬।

৯ Ettinghausen, *op. cit.*, p. 32.

১০ K. A. C. Creswell, *Early Muslim Architecture*, vol. I, Part-II (Oxford: The Clarendon Press, 1969), p. 407.

১১ এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য* (ঢাকা: খান ব্রাদ্রার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৬). পৃ. ১৬২।

১২ D. T. Rice, *Islamic Painting : A Survey* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971), p. 21.

১৩ Creswell, *op. cit.*, p. 512.

১৪ D. T. Rice, *Islamic Art* (London: Thames and Hudson, 1975), p. 24.

১৫ Najma Begum, *Portryal of Women in Mughal Painting : A Study Based on Illustrated Manuscripts and Album Drawings* (Ph.D Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1994), p. 69.

১৬ Ettinghausen, *op. cit.*, p. 34; Creswell, *op. cit.*, p. 512.

১৭ *Ibid.*, p. 34.

১৮ Creswell, *op. cit.*, p. 512.

১৯ রেকাব: আরবি শব্দ রেকাব হলো ঘোড়ার জিনের দু-পাশে ঝুলানো ঘোড়সাওয়ারের পা-দান বিশেষ। জামিল চৌধুরী, *আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), পৃ. ১১৮৭।

২০ হোসেন, *পূর্বোক্ত*. পৃ. ১২৭; Markus Hattstein (ed.), *Islam : Art and Architecture* (German: h.f.ullaman publishing GmbH, 2013), p. 86.

২১ Rice, *Islamic Art*, *op. cit.*, p. 24.

২২ *Ibid*, p. 33.

[২৩] *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ৪১।

[২৪] Rice, *Islamic Art*, p. 33.

[২৫] Ibid, p. 26.

[২৬] মায়াবাদ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের একটি মৌলিক ধারণা এবং বেদান্ত দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ মতবাদের মূল কথা হলো ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। [the struggle between a good (spiritual world of light) and an evil (material world of darkness.)]

[২৭] ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত *anima* (*"soul, life"*)-এর সঙ্গে ইংরেজী ism (ইজম) শব্দ সংযোজনে animism (*anima* + ism) শব্দের উৎপত্তি, যার বাংলা অর্থ *সর্বপ্রাণবাদ*। এর মূল কথা হলো সকল বস্তুর প্রাণ আছে (গাছ-পালা, জড় ও প্রাকৃতিক বস্তু)। সেই প্রাণ কোন ধরনের দৈহিক কাঠামো ব্যতিরেখেই প্রাণবন্ত বা স্বচল।

[২৮] Najma Begum, *op. cit.*, p. 70.

[২৯] *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ৫৯।

[৩০] Ettinghausen, *op. cit.*, p. 123.

[৩১] উদ বীণা জাতীয় এক ধরনের সঙ্গীতযন্ত্র, আধুনিক যুগের বাদ্যযন্ত্র গিটারের ন্যায়।

[৩২] P. Sykes, *History of Persia* (London: Macmillan & Co. Ltd, 1963), p. 5.

[৩৩] *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ৮১।

[৩৪] বাগদাদ ও সামাররা স্থাপত্যের ছাদ সরাসরি স্তম্ভের উপর ন্যস্তকরণ স্থাপত্যের ইতিহাসে অ্যাকিমেনীয়দের সময় থেকে প্রচলিত ছিল এবং আব্বাসীয় স্থাপত্যের যে *হাইপোস্টাইল* হল বা স্তম্ভসারি বিশিষ্ট ইমারত পরিদৃষ্ট হয় তা অ্যাকিমেনীয় স্থাপত্যের এক অনন্য অবদান।

[৩৫] সত্রাপ (satrap): প্রাচীন মেসিডোনীয় রাজ্যভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনসহ রাজ্যপাল হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনাকারী শাসকগোষ্ঠী সত্রাপ নামে অভিহিত। অর্থাৎ সত্রাপ হলেন প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক গভর্ণর।

[৩৬] ইসলামী স্থাপত্যে গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার ও সুউচ্চ ইওয়ান-ই-প্রবেশপথ নির্মাণ পার্থীয়দের অসামান্য অবদানের কথাই স্মরণ করে দেয়। তবে মুসলিম স্থাপত্যে চার আক্ষিক ইওয়ান পথের ধারণা মুসলমানদের নিজস্ব উদ্ভাবন এবং সেলযুক মাদ্রাসায় এ রীতি প্রথম দৃশ্যমান।

[৩৭] ইসলামী স্থাপত্যে ব্যবহৃত বর্গাকার ভূমি নকশা, চতুষ্খিলান নির্মাণ রীতি (four-arched construction system), ডিম্বাকৃতির খিলান, নলাকৃতির খিলানছাদ, মুকার্নাস নকশা ও পলেস্তারার অলংকরণ প্রভৃতি সাসানীয় স্থাপত্যের অসামান্য অবদানের ফসল।

[৩৮] *ইসলামী ত্রিকলা*, পৃ. ৮১।

[৩৯] *তদেব*, পৃ. ৮২।

[৪০] Basil Gray, *Persian Painting* (London: Macmillan London Ltd., 1977), p. 58.

[৪১] *Ibid*, p. 34.

[৪২] মাহমুদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৮।

[৪৩] Hattstein (ed.), *op. cit.*, p. 429.

[৪৪] Gray, *op. cit.*, p. 139.

[৪৫] সোনালী ঐশ্বর্যের, সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশের, নীল নভোমণ্ডলের এবং শুভ্র (রূপালী) পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। পারসিক চিত্রকলায় সোনালী ও নীল রঙের আধিক্য প্রাচীন সাসানীয় পারসিক ও রূপালী রঙ চৈনিক ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করে দেয়।

[৪৬] আশরাফউদ্দীন আহমেদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৩), পৃ. ১৭।

[৪৭] S. M. Imamuddin, *Modern History of the Middle-East and North-Africa* (Dacca: S. M. Shabuddin, 1970), p. 112.

[৪৮] *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ১৩৭।

[৪৯] ফার্সি ভাষায় *মোরাক্কা* (muraqqa) অর্থ একত্রে সমাবেশ (patched together)। *মোরাক্কার* ইংরেজি প্রতিশব্দ অ্যালবাম হতে পারে। সুতরাং *মোরাক্কা* হলো বই আকারের একটি অ্যালবাম, যা সাধারণত সোনালী রঙে

রঞ্জিত ও নকশাকৃত *হাশীয়া* বা বর্ডার চিত্র দ্বারা বিশেষভাবে অলংকৃত। সাফাভী আমলে *মোরাক্কা* শিল্পের উদ্ভব ঘটলেও উসমানীয় শাসনামলে তা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর মোগল দরবারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে *মোরাক্কা* বাঁধাই শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে, লাক্ষা অলংকৃত চামড়া দিয়ে বাঁধাই করে রাখাই *মোরাক্কার* বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

[৫০] *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ১৫৭-৫৮।

[৫১] *তদেব*, পৃ. ১৭৫।

[৫২] Najma Begum, *op. cit.*, p. 137.

[৫৩] প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বর ও বর্ণ দ্বারা ভূষিত ধ্বনি বিশেষকে রাগ বলা হয়। এটি ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্বরবিন্যাস রীতি। এ রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে যেসব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাদেরকে *রাগমালা* সিরিজ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

[৫৪] Hattstein (ed.), *op. cit.*, p. 485.

[৫৫] *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ১৮২।

[৫৬] *তদেব*, পৃ. ১৮৩।

[৫৭] Najma Begum, *op. cit.*, p. 142.

[৫৮] সম্রাট আকবরের প্রিয় লিপিকার মুহাম্মদ হোসাইন কাশ্মিরীর উপাধি ছিল *যরীনকলম* অর্থ সোনালী কলম; সাফাভী যুগের প্রখ্যাত লিপিকার শাহ মুহাম্মদ আল-নিসাপুরীকেও অনুরূপ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। Hattstein (ed.), *op. cit.*, pp. 485 & 521.

[৫৯] *ইসলামী চিত্রকলা*, পৃ. ১৮৪।